KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল - ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর ওসমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫১/৫ ৫১/৬ ৫১/৭ ৫১/৮	Year of Publication : ভাদ্র ১৩৯৭ || Sep 1990 আশ্বিন ১৩৯৭ || Oct 1990 কার্তিক ১৩৯৭ || Nov 1990 অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ || Dec 1990
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C. D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৫ সেপটেম্বর ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

স্থূল ডারুইনবাদের সঙ্গে এক ধরণের স্থূল মার্কসবাদের মেলবন্ধন ঘটায় বিপ্লবীদের জীবনসংগ্রাম—তত্ত্ব কতখানি বিকৃত চেহারা নিয়েছে সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সেটাই।

অবিভক্ত বাঙলার শেষ দশ বছরের তথ্যসমৃদ্ধ রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারী নির্যাতন-মানসিকতার শেকড় সন্ধান করেছেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদের জীবনী।

উপাচার্যদের কাজ কি এখন শুধুই ছাত্র-শিক্ষক- কর্মচারীদের নানারকম চাপকে নিউট্রালাইজ করে স্টাটাসকো বজায় রাখা? অরুণ নাগের সুচিন্তিত অভিমত।

কাব্যের গহনলোকের স্বরূপ সন্ধানে ড. শুভ্রাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সন্দর্ভ "কাব্যলোক"।

মীনাক্ষী ঘোষের নিবন্ধের বিচার্য বিষয় বাঙলা কবিতায় ভারতীয় শূন্যতার কনসেপ্‌ট কিভাবে পশ্চিমা জামা গায়ে দিয়ে হারিয়েছে তার ইনফিনিটির মহত্ত্ব।

মূল চীনাভাষা থেকে আধুনিক কবি আই ছিং-এর কবিতার অনুবাদ।

নেপালী সাহিত্যের আদি কবি ভানুভক্ত বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা।

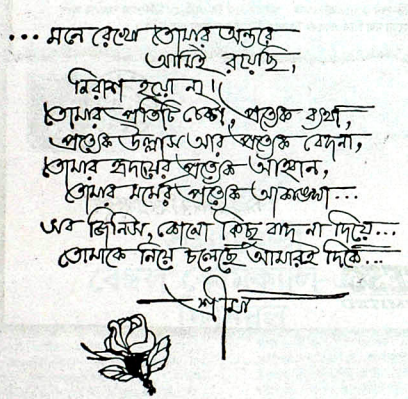

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ৫
সেপটেমবর ১৯৯০
ভাদ্র ১৩৯৭

মার্কসবাদ ও জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩৩৩
অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায় সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪৫
কাব্যলোক শুভ্রাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩৭৬

গণেশ পাইন যখন ছবি আঁকেন মৃণাল দত্ত ৩৪১
বিপদকালীন মেঘ কৃষ্ণা বসু ৩৪২
অবৈধ বিজন রায় ৩৪৩
কতটুকু মেঘ মুখোপাধ্যায় ৩৪৪

বোধন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৩

গ্রন্থসমালোচনা ৩৮৫
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, আজহারউদ্দীন খান, রণেন্দ্রনাথ দেব, শ্যামশ্রী লাল

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৩৯৭
নারীনির্যাতন : শেকড়ের সন্ধানে আহমদ শরীফ
ভারতবর্ষীয় শূন্যতা এবং কিছু বাঙলা কবিতা মীনাক্ষী ঘোষ

প্রতিবেশী সাহিত্য ৪০৮
নেপালী সাহিত্য : আদিকবি ভানুভক্ত কিরণশঙ্কর মৈত্র

বিদেশী সাহিত্য সংস্কৃতি ৪১৪
চীনের আধুনিক কবি আই ছিঙ প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়
জাপানি কবি দাইকাসু ইকেদা সন্তোষকুমার দে

মতামত ৪১৮
অরুণ নাগ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

MODERN PRINTING PRESS UNDER GOVERNMENT SECTOR
SUPERB PRINTING PERFORMANCE WITH

• OFFSET • LETTERPRESS
• ELECTRONIC DEVICES FOR COMPOSING WORK

FOR QUICK & QUALITY PRINTING

PLEASE CONTACT :

SHILPABARTA PRINTING PRESS LIMITED
(A. GOVT. OF W. B. UNDERTAKING)
25 & 27, CANAL SOUTH ROAD, CALCUTTA-700 015
DIAL : 24-9748 / 24-9569 / 24-3031

RAMKRISHNA PRINTING WORKS
QUALITY JOB & BOOK PRINTERS & GENERAL ORDER SUPPLIERS
44 SITARAM GHOSH STREET □ CALCUTTA 700 009 □ PHONE : 31 3543

মার্কসবাদ ও জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সত্তরের দশকে একটি-দুটি শ্লোগান শোনা যেত, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।' দ্বিতীয় শ্লোগানটির অন্য আর-একটি বয়ানও ছিল—'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই।'

অধুনা ইউরোপের পালাবদলের পালার কাহিনী পড়ে এবং দূরদর্শনে ওখানকার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে আমার এক "মার্কসবাদী কমিউনিস্ট" বন্ধু খুবই বিহ্বল ও বিষণ্ণ বোধ করছেন। কেন জানি না—স্বগতোক্তির ঢঙে মাঝে-মাঝে মন্ত্রোচ্চারণের মতো তিনি লড়াইয়ের উপরোক্ত দুটি শ্লোগান উচ্চারণ করেন। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি তো নিজেকে "মার্কসবাদী" বলেন, তাহলে এই শ্লোগান কেন? মার্কস তো কল্পনায়-স্নিগ্ধ, শোষণহীন, শ্রেণীহীন, "মানবতাবাদী" এক সমাজের কথা ভেবেছিলেন। সে সমাজের মূলমন্ত্র তো ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা এবং প্রেম। তাহলে?' বন্ধুটি মুচকি হেসে নিরুত্তর থাকেন, কোনো ব্যাখ্যা দেন নি আমাকে।

আমার মনে হল শ্লোগানটা তো স্থূল ডারউইনবাদ থেকে নেওয়া। শ্লোগানটার এত আবেদন দেখে আরও একটা কথা মনে হল : এদেশের মার্কসবাদী কর্মধারায়, সংগঠনে, প্রচারে আর শ্লোগানে স্থূল ডারউইনবাদের সঙ্গে এক ধরনের স্থূল মার্কসবাদের মেলবন্ধন ঘটেছে। এই প্রকল্প মানলে তবেই সত্তরের দশকের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের যুবকদের এক অংশের মানসিকতা এবং আমার বন্ধুটির মনের অভ্যন্তরের কথাটি বোঝা যায়।

এদেশের স্থূল মার্কসবাদীরা মার্কসবাদকে নিয়েছেন শুধু "শ্রেণীসংগ্রামের প্রাকৃত-দর্শন" হিসাবে। এঁরা শ্রেণীসংগ্রাম-বিলাসী। এঁদের দৃষ্টিতে মার্কস শুধুই শ্রেণীসংগ্রামের নাইট (knight)। মার্কস-দর্শনের গভীরে এঁরা যেতে চান নি কোনোদিনই। ফলে, এঁদের লেখায় দেখা যাবে স্থানকাল-পাত্র-নির্বিশেষে শ্রেণীসংগ্রামের কর্কশ আওয়াজ। নিখিল বিশ্বের ম্যাপে কলকাতাকে যেমন একটি 'বিন্দু' দিয়ে দেখানো অসঙ্গত নয়, তেমনি, উনিশ শতকে, ইংল্যানডের মূলধনী ব্যবস্থার বিশ্লেষণকালে, মোটামুটি প্রধান দুই যুযুধান শ্রেণীর কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক ছিল না। কিন্তু কলকাতার বিচিত্র রূপ বুঝতে গেলে শুধু 'বিন্দু' দেখলেই যেমন সব দেখা হল না, সব জানা হল না, তেমনি মানুষের ইতিহাসকে বুঝতে গেলেও শ্রেণীসংগ্রামের 'বিন্দু'-কে অতিক্রম করে, আরো বিশদে, আরো গভীরে, আরো ব্যাপকে যেতে হয়। মার্কস জানতেন—সব সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম চোখে পড়ে না। ভবিষ্যতেও

পড়বে না। যুগে-যুগে, কালে-কালে, শ্রেণীসংগ্রামের রূপ আর অভিব্যক্তিও আলাদা। শ্রেণীসংগ্রাম নামে কোনো মাস্টার কী (মস্ত চাবি) দিয়ে, একই ধরনে সব সমাজকে বুঝতে যাবার প্রয়াস কোরো না,—এই উপদেশই দিয়ে গেছেন মার্কস।

তাঁর ভয়ও ছিল যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁরই অকৃতী অথচ গুরুমর্যাদালোলুপ শিষ্যেরা হয়তো এই প্রকল্পটি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তাঁরই অসম্মান ঘটাবে। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, শিষ্যেরা এমন আতিশয্য করবে যে, গুরুর প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মাবে। হয়তো এজন্যই "শ্রেণী" সম্পর্কে তাঁর মতামত বিস্তারের কাজে হাত দিয়েছিলেন তিনি। "ক্যাপিটাল"-এর তৃতীয় খণ্ডে সে বিচারের সূত্রপাত মাত্র তিনি করে গেছেন; বিশদ আলোচনার সুযোগ পান নি। ফলে, খোলা মাঠে তাঁর অকৃতী শিষ্যেরা গুরুমারা বিদ্যা চালু রেখেছেন এতকাল—মার্কসবাদেরই নামে।

তাঁর শিষ্যেরা সেজন্যই স্থূল প্রাকৃত ডারউইনবাদের দ্বারস্থও হয়েছেন। বামাচারী সোস্যাল ডারউইনবাদ চালুও করেছিলেন দেশে-দেশে। আমার মতে, মার্কস একান্তবাদী শ্রেণীসংগ্রামী ছিলেন না। ইতিহাসে সংঘাত আর দ্বন্দ্ব আছে, একথা মার্কস জানতেন। ইতিহাসে অসংযম এবং অবিবেচনা আছে, একথাও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু তাই বলে, মানুষের সমগ্র সভ্যতার ইতিহাস শুধুই সংঘাতদীর্ণ শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, শুধুই মাৎস্যন্যায়ের ইতিহাস, এই তত্ত্ব হাজির করে ইতিহাসকে লাঞ্ছিত করেন নি তিনি। মার্কস জানতেন, মানুষের ইতিহাস সংগ্রাম আর সহযোগিতা, দ্বন্দ্ব আর মিলন, বৈরিতা আর সৌভ্রাত্রের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এবং একথা বললে ভুল হবে না যে, মার্কসকে যদি এ যুগে পাওয়া যেত, তবে তিনি বলতেন—প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রামীদের আমি পছন্দ করতাম উনিশ শতকে, আমার যুগে; ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি মানবতাবাদীদের বর্তমান যুগে।

দুই

এইসব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে মার্কসবাদ এবং ডারউইনবাদের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আবার উত্থাপন করা চলে। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করাও যায়। প্রশ্নগুলি এই :

(১) মার্কস-এঙ্গেলসের সঙ্গে ডারউইনের সম্পর্ক কেমন ছিল?

(২) উনিশ শতকের দুটি বিশিষ্ট মতবাদ—মার্কসবাদ এবং ডারউইনবাদ। এদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া, লেনদেন কি হয়েছিল?

(৩) ডারউইনবাদ একদিকে প্রভাবিত করেছে উদারনীতিবাদকে, এবং সাম্যবাদকে; অন্যদিকে ফ্যাসিবাদকে,—কিভাবে? ইত্যাদি।

তিন

ইংল্যানডের বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন সর্বপ্রথম নানা দেশ ঘুরে, নানান অবস্থায় গাছপালা আর জীবজন্তুর দৈনিক জীবনধারণের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করে দেখেছিলেন যে, 'জীবমাত্রই পরিবর্তনশীল'। তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনিই সর্বপ্রথম অজস্র প্রমাণ সহ একটি সন্তোষজনক 'মতবাদ' হাজির করেন। তাঁর বিখ্যাত *The Origin of the Species* ১৮৫৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় নানা কারণে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যুগপৎ ঘটে। ডারউইনের গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার আগে ওই বছর জুন মাসে, মার্কসের সুবিখ্যাত বই *A Critique of Political Economy* প্রকাশিত হয়। তখন কে ভেবেছিল যে প্রায় যুগপৎ প্রকাশিত এই দুটি বই পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এমন স্থায়ী প্রভাব রাখবে! অবশ্য একটা মজার ব্যাপার এখানে উল্লেখ

করতে হয়। ডারউইনের বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে নানা মহলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। দোকানে পৌঁছবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে *Origin of the Species*-এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। পরেও অনেক কাল বইটি ছিল "সর্বাধিক বিক্রীত" বইয়ের তালিকায়। অন্যদিকে মার্কসের *Critique*, গোড়ার দিকে, পাঠকসমাজের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে নি। কালক্রমে মার্কস যখন খানিকটা পরিচিতি লাভ করেন, তখন অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। আরও পরে মার্কস যখন খ্যাতি অর্জন করেন, তখনই শুধু বইটির বিক্রি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কয়েক দশক ধরে ডারউইনই ওদেশের সংস্কৃতিজগৎকে বেশি প্রভাবিত করেন।

অনেক দিন ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদের বর্ণচ্ছটায় সংস্কৃতির নানা দিগন্ত উদ্ভাসিত ছিল। এমনও দিন গেছে যখন 'সমাজতন্ত্রী', 'সমাজতন্ত্রবিরোধী', 'গণতন্ত্রী', 'গণতন্ত্রবিরোধী', প্রতিক্রিয়াশীল—সকলেই দাবি করতেন 'আমরা ডারউইনপন্থী'। কারা বেশি, তা নিয়ে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে মন-কষাকষিও হত। বৈজ্ঞানিকেরা তো বটেই, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, শিল্পী,—একদা অনেকেই, নিজেদের 'ডারউইনপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত করে গর্ববোধও করতেন। এই মতবাদ থেকেই অনেকে নতুন আইডিয়া পেয়েছেন, মনের পুষ্টি আহরণও করেছেন।

চার

১৮৮৩-র মার্চ মাস। মার্কস মারা গেছেন লনডনে। তাঁর সমাধিক্ষেত্রে সেদিন অল্প কয়েকজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তি—আর মার্কসের পরম-সুহৃদ এঙ্গেলস্ উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে দুজন বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। একজন হলেন রসায়নবিদ্ স্কোরলেম্মার। দ্বিতীয় জন, ডারউইনপন্থী জীববিজ্ঞানী—রয় ল্যাংকেস্টার। ওই স্থানে এঙ্গেলস একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ওই ভাষণেই তিনি প্রয়াত মার্কসের নাম যুক্ত করেন ডারউইনের সঙ্গে। তিনি বলেন—'ডারউইন যেমন জৈব-প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন ও বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, তেমনি মার্কস মানবেতিহাসের বিকাশধারার নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।'

পরবর্তী কালে এঙ্গেলসের এই মূল্যায়ন প্রবাদ-বাক্যের মতো হয়ে ওঠে মার্কসবাদী মহলে। একসময় মার্কসবাদ ও ডারউনবাদ একই সঙ্গে উচ্চারিত হত সত্য। তবে ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের নিজস্ব দর্শনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তবে একথাও সত্য যে ওই দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাকল্পেই তাঁরা ডারউইনের লেখা পড়তেন। ডারউইনকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করতেন। ডারউইনের কাছে তাঁদের ঋণ অনেক, তবুও একথাও সত্য যে মার্কস-এঙ্গেলসের জীবনবেদ তাঁদেরই নিজস্ব, শুধু ধারকরা নয়। তাঁরা নিজেদের মতবাদকে ডারউইন-এর মতামতের সঙ্গে 'একাকার' করে ফেলেন নি। সেটা করেছেন পরবর্তী কালের তথাকথিত মার্কসবাদীরা।

পাঁচ

১৮৫৯ সালে এঙ্গেলস বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করছেন। এমন সময় তাঁর হাতে এল ডারউইনের *The Origin of the Species* (প্রজাতির উৎপত্তি)। বইটি পড়ে এঙ্গেলস বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধায় আপ্লুত হলেন। ওই বছরের ডিসেমবর মাসে মার্কসকে এক চিঠিতে লিখলেন :

The Darwin which I am just reading, is really stupendous. Teleology, in one respect, had still not been finished off hitherto. It is now. Moreover, there has never yet been such a magnificent attempt made to demonstrate historical devolopment in nature or at least not so happily.

মার্কস বইটি পড়েন আরো কয়েক মাস পরে। বোধ হয় ১৮৬০ সালে। ওই বছরের ডিসেমবর মাসে মার্কস এঙ্গেলসকে লিখছেন—'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির যা প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি, এই বইটিতেই শুধু তা আছে।' ১৮৬১-র জানুয়ারি মাসে লাসালকে যে চিঠি লেখেন মার্কস, তাতেও ওই একই অভিমত পাওয়া যায় :

'ডারউইনের বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসে যে শ্রেণীসংগ্রাম দেখা যায় তার প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ রচনা করায় ওটি আমার কাজে লেগেছে। বইটিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। তবুও, এই প্রথম উদ্দেশীবাদকে একটি বই চরম আঘাত হানতে সমর্থ হল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে "টেলিওলজি" শুধু নিঃশেষিত হল না, এই বিজ্ঞানের তাৎপর্য, তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করাও গেল।'

ডারউইন, মার্কস ও এঙ্গেলস উনিশ শতকের যে যুগের মানুষ, সে যুগে সৃষ্টিতত্ত্বে লোকের বিশ্বাস রয়েছে। গোঁড়া খ্রীষ্টানরা তখনও মনে করতেন পৃথিবীর ইতিহাসের গোড়ার দিকে কোনো এক শুভক্ষণে ভগবান কয়েকটি প্রাণীর নমুনা সৃষ্টি করে পৃথিবীতে স্থাপন করেছিলেন। এদের সন্তান-সন্ততিতে ক্রমশ জগৎ ভরে গেল। ডারউইনই সর্বপ্রথম একটি সমন্বিত মতবাদ অর্থাৎ বিবর্তনবাদ উপস্থাপন করলেন। এই মতবাদ, তাঁর মনগড়া কাহিনী নয়। আগেই বলেছি নানান দেশ ঘুরে, নানান অবস্থায় গাছপালা আর জীবজন্তুর জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করে ডারউইন দেখালেন, জীবমাত্রই পরিবর্তনশীল। মার্কস তাই বলেছেন—its rational meaning is empirically explained। এঙ্গেলস মার্কস দুজনেই বলেছেন—এবার "teleology" (উদ্দেশী-বাদ)-র মৃত্যু হল ডারউইনের হাতে। ডারউইন দেখিয়েছেন, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) উপর নির্ভর করেই, ক্রম-বিবর্তনধারায় কিভাবে পৃথিবীতে এত বিচিত্র জীবজন্তুর জগৎ গড়ে উঠল,—তা ব্যাখ্যা করা যায়। এর ভিতর কোনো 'প্রেরণা', কোনো 'উদ্দেশী শক্তি', কোনো 'ঐশ্বরিক প্রভাব' মানবার কোনো প্রয়োজন নেই। মার্কস তাই প্রশংসাচ্ছলে বলেছিলেন, উনি উদ্দেশীবাদকে—teleology-কে—শেষ করে দিয়েছেন।

আর-একটা কথাও আছে। ইতিহাস পাঠ করে যে শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বে পৌঁছেছিলেন মার্কস, অনেকটা অনুরূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন ডারউইন জীবজন্তুর জগতে। তত্ত্বটি হল "টিঁকে-থাকার"—"বাঁচার" সংগ্রাম (struggle for existence) তত্ত্ব। মার্কস ভেবে-ছিলেন, এই তত্ত্বটিও তাঁর কাজে লাগতে পারে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ আর প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। ডারউইন দেখালেন—জীবজন্তুর জগতে পরিবর্তন আছে। আজ যাকে বলছি মানুষ, সে কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যে এই রূপ নিয়েছে তার ঠিক নেই। সুদূর অতীতে মানুষ ছিল না, ছিল বনমানুষ; তারও আগে ছিল বানরাকৃতির এক প্রাণী। আরও পিছিয়ে গেলে দেখা যেত—অ্যামিবার মতো এক ক্ষুদ্র, নগণ্য, এককোষী জীবই। সহজ থেকে জটিল, জটিল থেকে জটিলতর, অ্যামিবা থেকে আরম্ভ করে, নানা শাখাপ্রশাখায় বিকশিত হয়ে, বনমানুষের পর্ব অতিক্রম করে—জীবজন্তুর জগতের ধারাবাহিক বিকাশের কাহিনীই ডারউইনের "তত্ত্ব"।

অচেতনভাবে হলেও প্রকৃতিরও একটা প্রযুক্তির (technology) সাহায্যেই কাজ চলে। সেটার নাম "প্রাকৃতিক নির্বাচন" (natural selection)।

প্রকৃতিমাতা জীবজগতে একটি ধর্ম আরোপ করেছে—সেটা কী? ক্রমাগত বংশবৃদ্ধির চেষ্টা। খাদ্যবস্তু সংগ্রহের আর পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর চেষ্টায় তাই 'প্রতিযোগিতা' অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, খাবারে যখন টান পড়ে, তখন, অনেক সময় প্রতিযোগিতা হিংস্র-রূপও নেয়। জীবনরক্ষার এই প্রয়াসে যারা সফল হয়, তাদের নিশ্চয়ই কিছু "বিশেষ গুণ" আছে। সেই গুণগুলি বংশানুক্রমে (heredity) উৎকর্ষ লাভ করে। যাদের মধ্যে এই গুণগুলি বেশি ফুটে ওঠে, তারাই জীবনসংগ্রামে ভালো লড়িয়ে হয়। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে জীবনসংগ্রাম বাড়ে, জীবন-সংগ্রাম যতই বাড়ে, হেরে-যাওয়া প্রাণীরা ততই অবলুপ্তির পথে চলে; শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটি থেকে লোপ পেয়ে যায়। সব মিলিয়েই ডারউইনের "প্রাকৃতিক নির্বাচন"। আগেই বলেছি, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই জীবজগতের বিকাশধারা এগিয়ে চলে, কিন্তু এর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য, কিংবা প্রেরণা নেই।

মার্কস ভেবেছেন: ডারউইন-কথিত প্রকৃতির প্রযুক্তির সঙ্গে মনুষ্য-সমাজের প্রযুক্তির সাদৃশ্য টানা যায়। *Capital*, Vol. I, p 373-তে মার্কস লিখেছেন—

'Darwin has interested us in the history of Nature's Technology, i.e. in the formation of the organs of plants and animals, which organs serve as instruments of production for sustaining life. Does not the history of the productive organs of man, of organs that are the material basis of all social organisation, deserve equal attention?

Would not such a history be easier to compile, since, as Vico says, human history differs from natural history in this,—that we have made the former, but not the latter.

মার্কস বলতে চান, প্রকৃতির কর্মশালায় কেমন করে কাজ হয়, প্রাণীর জগৎ কেমন করে ক্রম-বিকাশের ধারায় গড়ে ওঠে, ডারউইন পড়েই আমরা তা জেনেছি। প্রকৃতির কর্মশালায় জীবজন্তুর জগৎ গড়ে ওঠে প্রকৃতির 'অচেতন প্রযুক্তি'-র সাহায্যে। মানুষের ইতিহাসের যজ্ঞশালায় সচেতন মানুষই তো প্রযুক্তিবিদ্। তাহলে মানুষের ইতিহাসের বাস্তব ধারাবাহিকতাকে সাজিয়ে তোলা যাবে না কেন?

এসব কথা থেকে বোঝা যাবে যে, মার্কস ডারউইনের প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন। এই আকর্ষণের আরও প্রমাণ আছে। "ক্যাপিটাল"-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে মার্কস এক কপি উপহার দেন ডারউইনকে। ধরে নেওয়া যায় ডারউইনের মতামত পেলে মার্কস উৎসাহিত হতেন, পুস্তকটির প্রচারেও সুবিধা হত। কিন্তু ডারউইন বইটি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ দেখান নি। ১৮৭৩-এর ১লা অকটোবর ডারউইন মার্কসকে লেখেন—

Dear Sir,

Thank you for the honour you have done me by sending your great work on Capital and I heartily wish that I was more worthy to receive it, by understanding more of the deep and important subject of political economy. Though our studies have been so different, I believe that we both earnestly desire the extension of knowledge, and that, this in the long run is sure to add to the happiness of Mankind. I remain, Dear Sir, yours faithfully,

Charles Darwin

১৮৮০ সালে মার্কসের "ক্যাপিটাল"-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। তখন মার্কস পরিচিত হয়েছেন। তবুও ডারউইন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ পাবার আগে ডারউইনকে একটি চিঠি লেখেন মার্কস: 'আমার এই দ্বিতীয় খণ্ড আপনাকে উৎসর্গ করতে চাই'। ১৮৮০ সালের ১৩ই অকটোবর ডারউইন সৌজন্যমূলক উত্তর দিলেও, লেখেন, 'আমি খুবই দুঃখিত যে আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মতি জানাতে পারলাম না।' [Marx: *Sociology, Social Change, Capital:* Edited by Mequer

Quartal Books. London, pp 153-154.]

একুশের শতকের জগতের প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছে আজ আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত—ডারউইনের মতবাদ তখনকার সমাজে কতখানি বিপ্লবই না এনে দিয়েছিল। কেবল যে বিজ্ঞানীদের অথবা মার্কস-এঙ্গেলসকে নাড়া দিয়েছিল তাই নয়, গত শতাব্দীর সমস্ত চিন্তার ধারায় এনেছিল বিপ্লব। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডারউইনবাদের প্রভাব পড়েছিল। ডারউইন-বাদের "জীবগতের প্রতিযোগিতা-তত্ত্ব" থেকে লেসে-ফেয়ার উদারনীতিবাদ,—'অবাধ বাণিজ্য', 'খোলা-বাজার' প্রভৃতি থিওরি খাড়া হয়েছিল। ডারউইনের জীবনসংগ্রাম অথবা বাঁচার লড়াইয়ের উপর একান্ত ঝোঁক দিয়ে অনেক মার্কসবাদী সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামকেই পরমসত্য হিসাবে হাজির করেছিল। অন্যপক্ষে, ফ্যাসিস্তরা "যোগ্যতমের উদ্বর্তনতত্ত্বে"র উপর জোর দিয়ে খাড়া করেছিল তাদের মতবাদ। জার্মান জাতি রক্তশুদ্ধতায়, ক্ষাত্রধর্মে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিশেষগুণসম্পন্ন। জীবনসংগ্রামে এরাই জিতবে যোগ্য-তম হিসাবে, অন্য জাতিরা পরাভূত হবে জীবধর্মের নিয়মে।

অথচ এই একপেশে ভাষ্য চালু হবার কোনো বৈজ্ঞানিক হেতু ছিল না। ডারউইন নিজেই তাঁর মতবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গেছেন। মার্কসও জীবজগতের বিবর্তনের একটি বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন ডারউইনবাদ থেকে। যদিও তত্ত্বটি জীবজগতের—বায়োলজির রাজ্যের—কথা, তবুও মার্কস ভেবে-ছিলেন, অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও, জীবনসংগ্রামতত্ত্ব তাঁর শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দেবে।

এখানে বলা ভালো, উনিশের শতকের দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল মূলত যান্ত্রিক—মেকানিস্টিক। ওই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সেকালে অনেকেই ভেবেছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম (natural selection) বিশ্ব-প্রকৃতিরই নিয়ম। এই নিয়ম খাটবে অণু-পরমাণুর রাজ্যে, উদ্ভিদ আর প্রাণীর জগতে, এমনকী মানুষের সমাজে। মতপার্থক্যটা ছিল প্রকৃতির প্রযুক্তির কোন্ উপাদানটা মুখ্য তাই নিয়ে—প্রতিযোগিতা: জীবনসংগ্রাম না যোগ্যতমের উদ্বর্তন—survival of the fittest? শুধু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থেকেই ডারউইনবাদের উদারনৈতিক ধারা কিংবা সাম্যবাদী ধারা, কিংবা ফ্যাসিবাদী ধারার উদয় যে হয় নি, একথা বলাই বাহুল্য। রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র কিংবা জাতিশ্রেষ্ঠত্ব যাদের আদর্শ তারাই বড়ো করে তুলে ধরল survival of the fittest—যোগ্যতমের উদ্বর্তনতত্ত্বকে। যাদের কাম্য ছিল অবাধ বাণিজ্য, অবাধ প্রতিযোগিতা, তারা ডারউইন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাত যে, প্রাণধারণের প্রয়াসে জীবজন্তুর মধ্যে দেখা যায় অবাধ প্রতি-যোগিতা, প্রতিযোগিতাই জীবধর্ম।

আর মার্কসের পরবর্তী যুগের শ্রেণীসংগ্রামবিলাসী প্রাকৃত মার্কসবাদীরা বলত—শ্রেণীসংগ্রামই মানুষের ইতিহাসের একমাত্র চালিকা শক্তি। আরও বলত ডারউইন দেখিয়ে গেছেন—প্রাণীর জগতে বাঁচার লড়াইটাই চূড়ান্ত সত্য। আহার জোটাবার জন্য এবং প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে জীবজন্তুকে লড়াই করতে হয়, লড়াই করে বাঁচতে হয়। 'বাঁচার লড়াই'-টাই প্রকৃত জীবধর্ম। জীবজগতের যা বাঁচার লড়াই, মানুষের সমাজে তার নামই শ্রেণীসংগ্রাম।

নিজ-নিজ মতবাদের স্বার্থে নানা মুনি ডারউইনের মতবাদকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কাজে লাগাবার প্রয়াস পেয়েছেন। ডারউইন স্বয়ং তাঁর মতবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি বলেছেন :

"I should premise that I use this term in a large and metaphorical sense, including dependence of one being on another, and including (which is more important) not only the life of the individual but success in leaving a progeny.'

দেখা যাচ্ছে, ডারউইন স্বয়ং বলছেন 'জীবনসংগ্রাম'-

কে তিনি ব্যাপক রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। এর অন্তর্গত—পরস্পর-নির্ভরতা, পারস্পরিকতা। শুধু তাই নয়। ব্যক্তির জীবন অতিক্রম করে বংশ-রক্ষায় সাফল্যও এর অন্তরভুক্ত। জীবনসংগ্রামকে যারা শুধু রেষারেষি, ঠেলাঠেলি, প্রতিযোগিতা কিংবা রক্তাক্ত সংগ্রাম হিসাবে দেখে, ডারউইন সেই দেখাকে অলীক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জীবনসংগ্রামকে তিনি এক প্রাণীর সঙ্গে অপর একটি প্রাণীর মরণপণ লড়াই হিসাবে মোটেই উপস্থাপন করেন নি। পরিবর্তন, বংশানুক্রম প্রভৃতি উপাদানের সহযোগে, প্রাকৃতিক বাছাইয়ের ফলে, ধীরে-ধীরে, অল্প-অল্প বৈশিষ্ট্য পুঞ্জিত হতে-হতে, শেষে নতুন এক প্রজাতির উদ্বর্তন ঘটে। সমগ্র প্রক্রিয়াটির নাম 'জীবন-সংগ্রাম'। [*The Origin of the Species:* New York : 1917, pp 78].

ওই পুস্তকেরই অন্যত্র তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, জীবনসংগ্রামে দুটি দিক। প্রকৃতির চালুনির বাছাই-এর মধ্য দিয়ে পরিত্যক্ত হয়ে, শেষে লোপ পাওয়া (elimination), অন্যদিকে টিঁকে থাকার রক্ষণাত্মক প্রতিক্রিয়া (reaction of protection and preservation)। তাই ডারউইন বলেছেন—'In these several senses which pass into each other, I use for convenience' sake the general term struggle for existence' [তদেব, পৃ ৭৮]

অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের যে প্রযুক্তির কথা শুনে (ডারউইনের কাছ থেকে) মার্কস মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মধ্যে (ক) সংগ্রাম আছে, (খ) রেষারেষি আছে, (গ) পারস্পরিকতা ও পরস্পরনির্ভরতা আছে, (ঘ) বংশানুক্রম (heredity) আছে, (ঙ) গুণাবলীর অনুবর্তন আছে (transmission), (চ) যৌন-নির্বাচন আছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে এ ধরনের নানা কলাকৌশল আছে বলেই—কালপ্রবাহে—হাজার-হাজার বছরের ক্রমপুঞ্জিত বৈশিষ্ট্য সঞ্চিত হতে-হতে তবেই নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। এত কথা বার-বার না বলে, কাজের সুবিধার জন্য (for convenience) ডারউইন "জীবনসংগ্রাম" সূত্রটি ব্যবহার করেছেন।

ডারউইন আর মার্কসের যুগ অনেক দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানে নতুন তথ্য, নতুন সংবাদ সংযোজিত হয়েছে। পৃথিবীর রূপ গেছে পালটে। ইতিহাসের ধারায় কত তন্ত্র, ইজম এসেছে, আবার গেছে। এই প্রসঙ্গে ডারউইনবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করা প্রয়োজন। এতদিনে ইতিহাস দেখিয়েছে যে ডারউইনের মতবাদের জের টেনে জাত্যভিমান, জাতিশ্রেষ্ঠত্ব, অভিজাততন্ত্র কিংবা ফ্যাসিবাদ প্রতিপন্ন করা চলে না। অন্যদিকে, কেবল-শ্রেণী-সংগ্রাম-তত্ত্বও ডারউইনবাদ থেকে নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত হিসাবে টানা চলে না।

প্রথমত, ডারউইন আর মার্কসের আমলে ইকোলজি [পরিবেশ-বিজ্ঞানের] নেহাতই শৈশবাবস্থা ছিল। ইকোলজির দৌলতে আজ জানা গেছে যে, সমবায়-অসহযোগ, সংঘাত-মিলন, অনুকূলতা-প্রতি-কূলতা প্রভৃতি ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ গড়ে ওঠে। এমন কোনো জীব নেই যে সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে, একা-একা "লড়াই" করে বাঁচতে পারে। প্রত্যেক প্রাণীর জীবন আরো পাঁচটা প্রাণীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত। উদ্ভিদকে এ বিষয়ে তুলনায় খানিকটা স্বাধীন হলেও বাতাস আর মাটি থেকে খাদ্য আহরণ করতে হয়। পৃথিবীর যেখানেই উদ্ভিদ আর জন্তু একত্রে বাস করে তাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক, অহি-নকুল ভাব ছাড়াও নানারকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খাপছাড়া, শুধু বৈরী-বিশৃঙ্খলার মধ্যেই যে তারা বাস করে তা নয়। একটা শৃঙ্খলা আর সামঞ্জস্যের মধ্যেও, নিজেদের খাপ খাইয়ে তাদের বাস করতে হয়। উদ্ভিদ ও পোকার মধ্যে সহযোগের নানা দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। অর্থাৎ ইকোলজি দেখিয়েছে যে, স্থানীয় আবহাওয়া, জল-মাটি প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারেই এক-

ধরনের গাছপালা, জন্তুজানোয়ারকে নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ। তাদের মধ্যে সংগ্রামের অন্ত নেই; তেমনি আবার তারা নানা সহযোগিতার সূত্রে বাঁধা। মানুষের জগতে কথাগুলি আরো বেশি সত্য। কী অর্থনীতিতে, কী সমাজে, কী আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে, কী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, সর্বত্র—অসহযোগ-সহযোগ, বৈরিতা-মৈত্রী, সংগ্রাম-সন্ধির বন্ধন আছে। ইকোলজি দেখিয়েছে যে, জড়জগৎ, প্রাণীর জগৎ ও মানুষের জগৎ প্রকৃতির সাম্যনীতিরই (balance of nature) অধীন। অনেক সময় এই সাম্যনীতি ভাঙতে চায় মানুষ। তার ফলে তাকে অশেষ দুঃখ ভোগ করতেও হয়। অধুনা ইকোলজির সম্মান বেড়েছে সব দেশেই। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজনীতিতে, দর্শনে নতুন কথাও শোনা যাচ্ছে। হাতুড়েদের শ্রেণী-সংগ্রাম-বিলাস যাচ্ছে নেপথ্যে; নতুন শ্লোগান উঠেছে: সংহতি চাই, মৈত্রী চাই—চাই solidarity।

দ্বিতীয় কথাটি আরো গুরুত্বপূর্ণ: আধুনিক সমাজের প্রযুক্তিগত বনিয়াদ,—এই সমাজের অর্থ-নৈতিক কাঠামো আজ আন্তর্জাতিক, এমনকী বলা চলে, সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। ফলে সমস্যার সমাধান হবে আন্তর্জাতিক স্তরে। এ যুগটাই এমন যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদানপ্রদান; জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পরনির্ভরতাই হল জীবনসংগ্রামের মূল কথা, সে কী বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, কী জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এই যুগের দাবিই হল, সমগ্র মানবজাতির তথা নিখিলবিশ্বের "ঐক্য" চাই। ফলে, তিরিশ বছর ধরে মতাদর্শগত লড়াইয়ের মুখরভাষণ অনেক স্তিমিত হয়েছে, অগ্নিগ্রাদক শ্রেণীসংগ্রাম-বিলাসীর উচ্চকণ্ঠতা হ্রাস পেয়েছে, বৃহৎশক্তিবর্গ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তির পথের সন্ধান করছে। আজ অনেকেই বুঝেছেন যে মানবজাতির বেঁচে থাকার স্বার্থেই তিনটি নীতি মেনে নিতে হবে—

এক: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি,

দুই: সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের নীতি,

তিন: শান্তিপূর্ণ পথে সমাজপরিবর্তনের নীতি।

গত শতাব্দীর মানুষ হয়েও মার্কস বুঝেছিলেন, ইতিহাসে শ্রেণীসংগ্রাম আছে। কিন্তু এই সংগ্রামের শেষ হয় 'গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে' অথবা 'দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।' [কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার: মার্কস-এঙ্গেলস] তখন তবুও 'জেতা' কিংবা 'ধ্বংস হওয়া' দুটো সম্ভাবনা ছিল। এখন জেতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এদেশের 'বাঁচার লড়াইয়েরা' এসব বোঝে না। বোঝে না যে, এই যুগে, বাঁচার লড়াইয়ে, শ্রেণীসংগ্রামে, জেতবার প্রযুক্তিগত পূর্বশর্ত নেই। কাঁচা, অমার্জিত, নিতান্ত সহজবোধ্য শ্রেণীসংগ্রামের আওয়াজ তোলা সহজ, জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

তবু মানুষ তো অভ্যাসের আর স্বভাবের দাস। অর 'স্বভাব যায় না মলে'। পৃথিবী বদলাবে, সমাজ বদলাবে, মানুষ বদলে যাবে, যুগ পালটাবে, তবুও শ্রেণীসংগ্রামবিলাসীরা সুর করে গাইবেন, 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই / লড়াই করে বাঁচতে চাই'॥

গণেশ পাইন যখন ছবি আঁকেন

মৃণাল দত্ত

গণেশ পাইন যখন ছবি আঁকেন তখন তাঁর
২০ বাই ৩০ সাইজ ক্যানভাস হয়ে যায় অনন্ত আকাশ
আমরা দেখি নির্লিপ্ত এক রাত্রি, সপ্তর্ষিমণ্ডল ফুটে উঠেছে এক লহমায়।

ক্যানভাসে যখন তুলি ছোঁয়ান গণেশ পাইন
বিচিত্র বর্ণসম্ভারে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে
আসমুদ্রহিমাচল, ভারতবর্ষ
তার দেশকাল, ইতিহাস, অনিঃশেষ ভৌগোলিক সীমা, পরিকাঠামো
সংস্কৃতি আর গৌরবময় ঐতিহ্য তার ধারাবাহিকতা, এবং
এক অত্যন্ত অপরিজ্ঞাত স্বপ্নময় অতীত ও আবর্তিত বর্তমানকাল।

বিপদকালীন মেঘ

কৃষ্ণা বসু

বাতাসে ভাসছে বারুদস্তূপের ঘ্রাণ,
কোথায় ছুটেছে অশ্বমেধের ঘোড়া?
ঈশানের কোণে গূঢ় বিদ্যুৎরেখা
চেয়ে আছে চুপ ধ্বংসলীলার দিকে;
মানুষ খেয়েছে মানুষের উৎসব,
মানুষ খেয়েছে আত্মরতির বিষ;
মানুষ ছিঁড়েছে মানুষের মায়াসুতো,
মানুষ শিখেছে ক্রান্তিকালের গান,
শেষ হয়ে এল প্রবীণ শতক আজ,
বিপদকালীন মেঘ ঝুঁকে নুয়ে আছে
আগামী দিনের দিকে, সমাপতনের
গান বাজে চারিভিতে, গুরু গুরু গুরু
ধ্বংস-ডমরু বাজে, কী জানি কিসের
সংকেতে বেলা কাটে, কিসের যুদ্ধ!
কেন এত প্রাণপণ! কোন্‌খানে আছে
সমর্পণের বাণী? কোন্‌খানে নেই?
রণকৌশলে মেতে মানুষ খেয়েছে
মানুষের নীল আয়ু; গুরু গুরু গুরু
ধ্বংস-ডমরু বাজে, একবিংশতি
শতকের দিকে ঈশানের গূঢ় কোণে
জমে আছে মেঘ, ক্রান্তিকালের গান
বাজে চরাচরে, এই শতাব্দী শেষ,
শেষ হয়ে এল মানুষের ইতিহাস,
একবিংশতি শতকের সাদা দিনে
যুদ্ধশেষের আগুন আয়ুধ, হায়,
ফাঁকা পৃথিবীকে পাহারা দিচ্ছে দেখে
মরা মানুষের সাদা কঙ্কাল হাসে!

অবৈধ

বিজন রায়

একশো মুহূর্ত পুড়েছি আমি এক ভৈরবীর ক্রোধে।
সিদ্ধ পিশাচ? না কি হঠযোগিনী?
তখনও আমার চোখ খোলে নি
পরে বুঝেছি, সোনার ঝাঁপি ধ্বংস হল প্রাচীন মগধে।

কতটুকু

মেঘ মুখোপাধ্যায়

কতটুকু তোমার শরীর
আর কতটুকুই বা তোমার মেধা !
বড়ো জোর একচিমটি, একমুঠোও নয়
ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে তুচ্ছ নগণ্য পরমায়ু

তোমার শরীর থেকে সময়ের মোম
স্বপ্নের সংস্রব গলে পড়ে—খেয়াল রেখেছ ?
এই মেধা ক্ষয়ে যায়, যায়, ক্ষয়ে ক্ষয়ে
তবুও সে জ্বলে—এই মজা—
এই মজা তোমাকে মশগুল করে রাখে বাকবিতণ্ডায়
তুখোড় বিতর্কে, মসৃণ ও তীক্ষ্ণ বচনে, ব্যঙ্গ উপহাসে
আর পরিমিত অশ্লীল আলাপে—কীর্তনে মজায়

নোখের ডগায় তুলে তোমাকে নাচাতে পারে
এরকম ওস্তাদ খেলুড়ে এই কাল
তুমিও কালের মুখে হাই তুলে তুড়ি মার জানি
তবুও এ অগম সংলাপ

তোমার চতুর্দিকে অবিশ্বাস, খাদ, গহ্বর ও বাঁক
যে কোনো মুহূর্তে তুমি বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে থেকে
উপে যেতে পার ; তোমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রে
উদ্বেগের দাঁত চিবোতে চিবোতে বলবে
কতটুকু তোমার শরীর
আর কতটুকুই বা তোমার মেধা
হাঃ হাঃ

অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায় : ১৯৩৭—১৯৪৭

সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। এর ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরাধীন ভারতে এই প্রথম ভারতীয় জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে যোগ দেয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। লেখকের তরফে তাই এই পর্বটি বেছে নেওয়া হয়েছে।]

বাঙলাদেশের ইতিহাসে বিংশ শতক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ১৯০৫ সালে এখান থেকেই স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। অন্যদিকে বাঙলার মুসলমান নেতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁ মুসলমানদের সংগঠিত করে মুসলিম লীগ তৈরি করার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে ভাগ্য পরীক্ষা করতে দিল্লিতে আসেন, পরে মোগল দরবারে ঠাঁই পান। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর, এঁরা বাঙলাদেশের শ্রীহট্ট অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। ব্যাবসা ছিল এঁদের মূল পেশা। ধীরে-ধীরে শ্রীহট্ট অঞ্চলে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। পরে তাঁরা ঢাকায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। ক্রমে পূর্ববাঙলার মুসলমান সমাজের নেতা হিসাবে সলিমুল্লা খাঁ পরিচিতি লাভ করেন। প্রথমে তিনি লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। পরে মুসলমান সমাজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে, তিনি লর্ড কার্জনের কুখ্যাত পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেমবর ঢাকার নবাব-বাড়ি "আহসান মনজিলে" সারা-ভারত মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়। মুসলমানদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আর সমস্যা নিয়ে লীগ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারও কংগ্রেসের বিরোধী হিসেবে লীগকে গুরুত্ব দিতে থাকে।

১৯০৭ সালে কলকাতায় লীগের প্রাদেশিক অফিস স্থাপিত হয়। এই সময়ে বাঙলার মুসলমান সমাজের মধ্যে আত্মসচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে আসেন

বরিশালের যুবক ফজলুল হক। তিনি ছিলেন বাঙলার কৃষকসমাজের প্রতিনিধি। তাঁরই নেতৃত্বে বাঙলাদেশে প্রজা-আন্দোলন শুরু হয়। ধীরে-ধীরে এই প্রজা-আন্দোলন পূর্ববাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফজলুল হক লীগেরও সদস্য ছিলেন। এই সময়ে কৃষক-প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কংগ্রেস বা লীগের কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিল না। তাই কৃষক-প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ফজলুল হক কৃষক-প্রজা-পার্টি (১৯২৭) তৈরি করেন। ধীরে-ধীরে এই সমিতির প্রভাব পূর্ববাঙলার গ্রামে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অতি দ্রুত ফজলুল হক বাঙলাদেশের কৃষক-প্রজাদের প্রিয়-পাত্র হয়ে ওঠেন।

১৯৩৫ সালে ইংরেজ সরকার ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। বাঙলাদেশে এই সময়ে মুসলিম লীগের কোনো প্রভাব না থাকায় এখানকার মুসলমান নেতারা নির্বাচনে নামার জন্য "ইউনাইটেড মোসলেম পার্টি" নামে একটি দল গঠন করেন।[১] ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি জিন্না বিলেত থেকে ফিরে এসে লীগের দায়িত্ব নিয়েছেন। জিন্নার প্রভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ব্যবসায়ী এম. এ. এইচ. ইসপাহানি লীগের কেন্দ্রীয় সভার সদস্য হন। তিনি কলকাতায় ব্যবসা করতেন। জিন্না সমস্ত মুসলমান দলগুলিকে সংঘবদ্ধ করে মুসলিম লীগের পতাকাতলে এনে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য চেষ্টা শুরু করেন।[২] এই অবস্থায় ইসপাহানি জিন্নাকে কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ফজলুল হকও জিন্নার নেতৃত্ব মেনে নির্বাচনে নামতে রাজি হন। আলোচনার ফলে জিন্নার নির্দেশে "ইউনাইটেড মোসলেম পার্টি" মুসলিম লীগের সঙ্গে মিশে যায়। ঢাকার নবাব হবিবুল্লা, খাজা নাজিমুদ্দিন, আকরম খাঁ, সোহরাবর্দি, মৌলানা আবদুল্লা, এল. বাকি, এ. এফ. রহমান, তমিজুদ্দিন খাঁ ও সাহাবুদ্দিন "ইউনাইটেড মোসলেম পার্টি"র প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য লীগের কেন্দ্রীয় সভার সদস্য নিযুক্ত হন। কৃষক-প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন ফজলুল হক স্বয়ং, নৌশের আলি, বগুড়ার হাসান আলি, সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং শামসুদ্দিন আহমেদ। জিন্নার নির্দেশে ইসপাহানির ভাই মিরজা আহমদ ইসপাহানি, আজিজ আনসারি, নুরুদ্দিন, এ. আর. সিদ্দিকি ও সেকেন্দর দেহলভিকে লীগের কেন্দ্রীয় সভার সদস্য নিযুক্ত করা হয়।[৩] এই নবনিযুক্ত পার্লামেনটারি বোর্ড নির্বাচনী খসড়া-ইশতাহার তৈরির জন্য মিলিত হল। ফজলুল হক নির্বাচনী ইশতাহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল ও সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানালে, জিন্নার সমর্থকরা তীব্রভাবে ফজলুল হকের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে ফজলুল হক আর তাঁর সমর্থকরা বৈঠক ছেড়ে চলে যান। পরে ফজলুল হক জিন্নার এই ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।[৪] জিন্না আর হকের এই মতপার্থক্য অস্বাভাবিক ছিল না। সর্বভারতীয় রাজনীতির স্বার্থে জিন্না জমিদারশ্রেণীর বিরাগভাজন হতে চান নি। অন্যদিকে ফজলুল হক বাঙলার দরিদ্র চাষি, প্রজা আর রায়তদের স্বার্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের পক্ষে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ফজলুল হক এই প্রসঙ্গে বলেন 'জিন্না মুসলিম লীগে অবাঙালি, জমিদার ও পুঁজিপতিদের বেশি করে স্থান দিয়েছেন।' তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'ঢাকার নবাব হবিবুল্লা, খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা সাহাবুদ্দিন জমিদারদের প্রতিনিধি। সোহরাবর্দি, এ. এফ. রহমান এবং আকরম খাঁ হলেন কলকাতার বাসিন্দা। এ ছাড়াও কলকাতার ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সাতজন প্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাঙলার রাজনীতি এইসব অবাঙালি ব্যবসায়ী আর পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে, এ তিনি কিছুতেই মেনে

নিতে পারবেন না'।[৫] তিনি তাই ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে জমিদার-পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে গরিবদের সংগ্রাম আরম্ভ হল। এই সংগ্রামে একদিকে থাকবে বাঙলার গরিব প্রজা, রায়ত আর চাষি, অন্যদিকে থাকবে ব্যবসায়ী, পুঁজিপতির দল।'[৬] লীগ আর প্রজা-পার্টির মধ্যে কোনো নির্বাচনী বোঝাপড়া না হওয়ায় দুটি দলই পৃথকভাবে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হয়।

ফজলুল হক এবং প্রজাপার্টি নির্বাচনী ইশতাহারে এবং বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় দরিদ্র জনসাধারণ, প্রজা আর কৃষকদের 'ডাল আর ভাত'-এর সংস্থান করার উপর জোর দেন। সাধারণ মানুষের কাছে ফজলুল হক আর প্রজাপার্টি এই কারণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে শহর, আধাশহর ও মফসলের শিক্ষিত মুসলমানশ্রেণী মুসলমানদের ঐক্যের আহ্বানে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। গ্রামাঞ্চলে ফজলুল হক আর তাঁর প্রজা-পার্টির প্রাধান্যকে খর্ব করার জন্য লীগ মুসলমান পুরোহিত বা উলেমাদের সাহায্য গ্রহণ করে। ফুরফুরার পীরসাহেব মৌলানা সুফী আবু বকর এবং জৌনপুরের পীর মুসলমানদের এক নির্দেশে লীগকে সমর্থন ও ভোট দেওয়ার আদেশ দেন।[৭] মৌলবাদীদের সমর্থনের পরেও ফজলুল হক ও তাঁর দলকে লীগ নির্বাচনে হারাতে পারে নি। এই নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনের প্রতিযোগী ছিলেন ফজলুল হক স্বয়ং। নাজিমুদ্দিন তাঁর নিজের জমিদারি ঢাকার পটুয়াখালিতে মনোনয়ন পান। ফলত ফজলুল হক ছিলেন বরিশাল জেলার লোক। তিনি নাজিমুদ্দিনকে চ্যালেনজ জানিয়ে একই কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র পেশ করেন। নাজিমুদ্দিন ছিলেন ছোটোলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও তাঁর সমর্থনপুষ্ট। ফজলুল হক তাই ঘোষণা করেন, 'তিনি নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না, প্রকৃত-পক্ষে বাঙলার ছোটোলাট স্যার জন এনডারসনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।'[৮] এই ঐতিহাসিক ভোটযুদ্ধে নাজিমুদ্দিন পরাস্ত হন। এই পরাজয়কে লীগের তৎকালীন নেতারা কখনই সহজভাবে গ্রহণ করেন নি। মুনসিগঞ্জের জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াজির আলিকে সোহরাবর্দি এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন, 'I don't think that Sir Nazimuddin would have lost to Mr. Fazlul Huq but for the support which Mr. Fazlul Huq received from the Hindus and certain other interested parties.'[৯] সোহরাবুর্দি যাই ভাবুন না কেন, বাখরগনজের তৎকালীন জেলাশাসকের মন্তব্যকে উল্লেখ করে ঢাকা বিভাগের কমিশনার নাজিমুদ্দিনের পরাজয়ের কারণ হিসেবে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।[১০] এই ভোটযুদ্ধে পরাজিত হন খাজা নাজিমুদ্দিন, বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সভাপতি সন্তোষের মহারাজা, জাতীয়তাবাদী দলের শ্রীবিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ববর্তী সভায় বিরোধীদের নেতা শ্রী এন. কে. বসু মহাশয়। আর ঢাকার নবাব, বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব, গৌরীপুরের বিখ্যাত জমিদার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নির্বাচনে জয়ী হন। পুরোনো সদস্যদের মধ্যে আজিজুল হক, বীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহরায়, রতনপুরের জমিদার স্যার কে. জি. এম ফারুকী ও সোহরাবর্দি পুনর্নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস দলগতভাবে ৫৪টি আসন পায়। আর ১১৯টি সংরক্ষিত মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪০টি, কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৮টি আর স্বতন্ত্র (ইনডিপেনডেনট) মুসলমান প্রার্থীরা ৪১টি আসন লাভ করে। সাধারণ আসনগুলি কংগ্রেস ছাড়া স্বতন্ত্র বর্ণহিন্দু, তফসিলি হিন্দু ও ইউরোপীয় প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ফলে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। এসময় বিধানসভায় কংগ্রেসে সরকারি ও বেসরকারি—দুটি দল ছিল। প্রথম দলটির নেতা ছিলেন শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, আর দ্বিতীয় দলটির নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীশরৎচন্দ্র বসু। নির্বাচন-পরবর্তী অবস্থা বিবেচনা করে ফজলুল হক কিরণশঙ্কর

রায়ের কাছে কোয়ালিশন বা যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৭ সালের ১৭-১৮ই মার্চ, দিল্লি অধিবেশনে স্থির করে যে প্রদেশের রাজ্যপাল বা গভর্নর যদি সুস্পষ্ট আশ্বাস দেন যে মন্ত্রিসভার কাজে তিনি কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না, তবেই কংগ্রেস যে-সমস্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে সেখানে মন্ত্রিসভা গঠন করবে। এ ছাড়া কিরণশঙ্কর রায় মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিনিময়ে বিনাবিচারে আটক সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির দাবি করেন। ফজলুল হক এই শর্ত গ্রহণে অসম্মত হন।[১১] কারণ রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়ে মন্ত্রিসভার কিছু করণীয় ছিল না। সমস্ত বিষয়টি রাজ্যপালের নিজস্ব বিষয়ের অন্তর্গত ছিল।এই অবস্থায় ফজলুল হক শেষ পর্যন্ত লীগের কাছে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আবেদন করেন। লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙলাদেশে প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বাঙলাদেশে প্রজাপার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে মন্ত্রিসভা গঠনের এক সুবর্ণসুযোগ কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়। লীগের নেতারা ফজলুল হকের প্রগতিশীল চিন্তা-ধারা ও বাঙালিয়ানার জন্য তাঁকে অপছন্দ করলেও, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই সুবর্ণসুযোগ গ্রহণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতৃত্ব সর্বভারতীয় রাজনীতির কারণে বাঙলাদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে রাজি হন নি। প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হলে, মুসলিম লীগ এত তাড়াতাড়ি বাঙলাদেশে প্রভাব বিস্তার করতে পারত কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হলে বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হত। যাই হোক, ফজলুল হক এই মন্ত্রিসভায় ৫ জন মুসলমান আর ৫ জন হিন্দু মন্ত্রী নিয়েছিলেন। তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্তের জন্য ফজলুল হককে অভিনন্দন জানানো হলেও, ১৮ই মার্চের আজাদ কাগজের প্রতিবেদনে এই ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে বলা হয় যে বাঙলার মুসলমান সমাজ কখনোই এই ৫০% : ৫০% ব্যবস্থা সহজে মেনে নেবে না।

ফজলুল হক আর তাঁর প্রজাপার্টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের পক্ষে ছিলেন। অন্যদিকে মন্ত্রি-সভার লীগ-সদস্যরা এর বিরোধী ছিলেন, কারণ বিধানসভায় লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভূস্বামী ও জমিদার। এই সদস্যরা প্রস্তাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। লীগের প্রভাবশালী সদস্য এক মন্ত্রী নবাব মোশারফ হোসেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, এই কারণে ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা থেকে সরাবার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত অর্থ ব্যয় করতেও প্রস্তুত আছেন।[১২] শেষ পর্যন্ত লীগ-সদস্যরা এই প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করেন। অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দোষগুণ খতিয়ে দেখার জন্য ফ্লাউড কমিশন গঠিত হয়।[১৩] এরপর ফজলুল হক নির্বাচনী ইশতাহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল বিধানসভায় আনেন। লীগ ও ইউরোপীয় সদস্যরা একযোগে এই প্রস্তাবিত বিলটির বিরোধিতা করেন। এইভাবে প্রথম থেকেই লীগ-সদস্যরা ফজলুল হকের প্রতিটি পদক্ষেপকে বানচাল করতে প্রস্তুত হন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হকের প্রস্তাবটি ১১০-২৭ ভোটে গৃহীত হয়।

এই সময়ে বিভিন্ন কারণে প্রজাপার্টির সদস্যদের মধ্যে হকের বিরোধিতা শুরু হয়। ফলে হককে বাদ দিয়ে প্রজাপার্টির নূতন কর্মসমিতি তৈরি হয়।[১৪] মন্ত্রিসভার ভূমি-রাজস্বনীতি নিয়ে মন্ত্রী নৌশের আলি অসন্তোষ প্রকাশ করায় ফজলুল হক ও অন্যান্য মন্ত্রীরা একযোগে পদত্যাগ করেন। পরে নৌশের আলিকে বাদ দিয়ে ফজলুল হক নূতন মন্ত্রিসভা তৈরি করেন। ফজলুল হকের নির্দেশে মন্ত্রিসভা বিভিন্ন অঞ্চলে ঋণ-সালিশি বোর্ড গঠন করে, কৃষক ও রায়তদের পুরোনো ঋণ শোধ দিয়ে চাষের জমি ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা

করে। একই সঙ্গে গ্রামবাঙলায় মহাজন ও সুদখোর-দের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মানিলেনডার্স অ্যাক্ট তৈরি হয়। ফজলুল হকের নেতৃত্বে লীগ-প্রজা মন্ত্রিসভা কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কৃষকদের শিক্ষিত করার জন্য তিনি কৃষিশিক্ষার উপর জোর দেন। লনডনে উচ্চ কৃষিশিক্ষায় জ্ঞানলাভের জন্য মন্ত্রিসভা তিনটি স্কলার-শিপের ব্যবস্থা করে। কৃষিপ্রদর্শনীতে প্রথম স্থান-অধিকারীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নগদমূল্যে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়।[১৫]

প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভার বিতর্কিত বিল ছিল দুটি। প্রথমটি হল মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আর দ্বিতীয়টি ছিল সাম্প্রদায়িক হারে কর্মচারী নিয়োগ বিল বা কমিউ-ন্যাল রেশিও অ্যাক্ট। প্রথম বিলটির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুপ্রভাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের অধীনে আনা। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের সদস্য-সংখ্যা ছিল ৫০ জন। এর মধ্যে ২০ জন করে সদস্য হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হবে। ইউরোপীয়দের মধ্য থেকে ৫ জন এবং অন্য ৫ জনকে অন্যভাবে নিয়োগ করা হবে। এই বিলের বিশেষত্ব ছিল এই যে, ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জনকে সরকার সরাসরি নিয়োগ করবেন। ১৪ জন সদস্য নিয়ে এগজিকিউটিভ কাউনসিল গঠিত হবে। এর মধ্যে ৬ জন সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে পদাধিকারবলে নিয়োজিত হবেন।[১৬] এই প্রস্তাবিত বিলটিকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কিরণশংকর রায় তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। কংগ্রেস নেতা কিরণশংকর রায় এই প্রস্তাবিত বিলটিকে 'রাজনৈতিক-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিল' বলে আখ্যা দেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষকসম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, 'If the Board is established, we shall defy them, we shall sever all our connections with such an anti-educational Board, and shall, if necessary, seek affiliation for our schools with an outside univer-sity.'[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রস্তাবিত বিলের সাম্প্রদায়িক চরিত্র দেখে ব্যথিত হন। ১৯৪০ সালে ২১শে ডিসেম্বর হাজরা পার্কে আয়োজিত প্রতিবাদসভায় প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, 'I am fully convinced that, of all the misdeeds and misadventures of the present ministry, the bill is the most mis-chievous from the national stand-point.'[১৮] রোগশয্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদপত্র পাঠাতেও দ্বিধা করেন নি। হিন্দু জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের তীব্র সমালোচনার ফলে এই বিলটি স্থগিত রাখা হয়। ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে মুসলমানদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে হিন্দুরা লীগ-প্রজা মন্ত্রিসভার প্রস্তাবিত বিলগুলির বিরোধিতা করে মুসলমানদের ন্যায্য দাবিগুলি আদায়ে বাধা সৃষ্টি করছে। এর ফলে ধীরে-ধীরে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা সাম্প্রদায়িক হারে সরকারি কর্মচারী নিয়োগেরও ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন বাস্তব কারণে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ও সরকারি দপ্তরে শিক্ষিত হিন্দুদের প্রাধান্য বেশি থাকায় মুসলমানদের চাকুরি পাওয়া সহজ ছিল না। মন্ত্রিসভা একজন অফিসারকে সাম্প্রদায়িক হারে কর্মচারী নিয়োগের প্রতি নজর রাখার নির্দেশ দেন। সরকারি চাকুরি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখা ও তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় হিন্দু জনসাধারণ তীব্র ভাষায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই মন্ত্রিসভা কলকাতা মিউনিসি-

প্যালিটি (সংশোধন) আইনটিও প্রণয়ন করে। কলকাতা কর্পোরেশনে হিন্দু কংগ্রেসের প্রাধান্য খর্ব করার জন্য এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। আইনটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ফজলুল হক নিজেই বলেছিলেন, 'We have particularly made it certain that Congress no longer dominates the Calcutta Corporation……we want to stop those nefarious influences of the Indian Congress in the Calcutta Corporation. I don't say that we have succeeded fully. The chances are that the Congress will not have a dominant voice in the Calcutta Corporation.'[১৯]

প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভার বিভিন্ন জনহিতকর আইন গ্রামবাঙলায় লীগের প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করে। মুসলমানদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এই মন্ত্রিসভা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সচেষ্ট। ফলে মন্ত্রিসভা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতা-কেন্দ্রিক কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রামবাঙলায় এই মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তা দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। গ্রামবাঙলায় নিজেদের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য কংগ্রেস এবার চেষ্টা শুরু করে। বিশেষত স্থানীয় পৌরসভা, জেলা-বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সংগঠনের স্থানীয় শাখাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও কয়েকজন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সরকার মনোনীত করতেন। কংগ্রেসের এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সরকারবিরোধী কোনো ব্যক্তিকে স্থানীয় বোর্ড-গুলিতে মনোনীত করা হবে না।[২০] এই সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় বোর্ডগুলির সদস্যপদে শুধুমাত্র লীগপন্থী মুসলমানদেরই মনোনীত করা শুরু হয়। স্থানীয় বোর্ডগুলি হাতে থাকার ফলে গ্রামবাঙলায় লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। লীগের প্রভাব বাড়াবার জন্য মন্ত্রিসভা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সুস্পষ্ট নির্দেশনামা জারি করে লীগপন্থীদের সবরকম সাহায্যের নির্দেশ দেন। চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন কমিশনার মার্টিন বাঙলা সরকারের মুখ্যসচিব ব্লাণ্ডিকে লেখেন, 'Muslim League is a purely political organisation and there is the futher difficulty that it has a definitely anti-Hindu bias. I find the League extraordinarily useful, at least in the Division, because their leaders are generally willing to come to the assistance of the officials and to give effect to their suggestions specially where is any sort of disturbances."[২১] তিনি স্বীকার করেন যে 'Some of the European officials are more sympathetic towards Muslims and Muslim propaganda'[২২] প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা সুপরিকল্পিত উপায়ে সরকারের মাধ্যমে লীগের প্রভাব বাড়াতে সমর্থ হয়। এই মন্ত্রিসভার সদস্যরা গ্রামবাঙলার মুসলমানদের বোঝাতে পেরে-ছিলেন যে এই মন্ত্রিসভা দরিদ্র, অর্থ নৈতিক আর সামাজিক ভাবে পিছিয়ে-পড়া মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য খুবই আগ্রহী। ফলে মুসল-মান সমাজ এই প্রজা-লীগ সরকারের প্রধান সমর্থকে পরিণত হয়। মুসলমাননের মধ্যে ধীরে-ধীরে আত্ম-সচেতনতা বাড়তে থাকে। তারা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এই সরকারকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করে। ফলে পূর্ব বাঙলায় লীগের সদস্য-সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। পরের পাতার তালিকা থেকে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

জেলার নাম	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ
				জেলা পুলিশ প্রধানের মন্তব্য
মুর্শিদাবাদ	১৪৫৫	১৭১৩	১৭৯৯	— — — —
যশোর	২৮২২	২৪৪১	২৭০৪	২-আনা সংস্যসংখ্যা বেড়েছে।
২৪-পরগনা	৮৫০	১৫০০	১৯০০	— ওই — —
খুলনা	১৫০০	১৫০০	১৯০০	লীগের সংগঠন বেড়েছে।
বাঁকুড়া	৩০	৫০	৭০	— — — —
বর্ধমান	৩৪৫০	৪৩০০	৬৪৭৭	লীগের প্রভাব অনেক বেড়েছে।
মেদিনীপুর	১০৩৭	১৩৯০	১৩৯৩	— — — —
বীরভূম	৫০০	১০০০	২৫০০০	'৪০-৪১' সালে জনগণনার সময় লীগের প্রচারে সদস্যসংখ্যা বেড়েছে
হুগলী	১০৩	৪৭৪	৭৫৪	— — — —
রাজশাহী	৩০৭৯	৪৯০৮	৫৬৮১	— — — —
জলপাইগুড়ি	৬০০০	৭০০০	৮০০০	লীগের জেলা সভাপতির দেওয়া হিসেব, সঠিক নাও হতে পারে।
মালদহ	—	২৯০০০	৪৩০০০	— — — —
পাবনা	১২৭৮৩	১৩৯০৪	১৪৫৭২	— — — —
দিনাজপুর	১৩৮২	৫০৮৭	৬১৮৬	লীগ-নেতাদের প্রচারের ফলে সদস্য-সংখ্যা বেড়েছে।
রঙপুর	৪৮৭৯	৭৬৪৯	১০৭০১	— — — —
ঢাকা	৩০০০০	৫০০০০	৪০০০০	— — — —
ময়মনসিংহ	৯৯২০	১৬০০০	৩৪০০০	— — — —
ফরিদপুর	১৬০০	১০৮০	১২৫০	— — — —
চট্টগ্রাম	৭০০	১০০০	১৫০০	— — — —
নোয়াখালি	৫০০	৫০০	৫০০	— — — —
হাওড়া	—	২০০০	২০০০	— — — —
বাখরগঞ্জ	—	—	২০০০	— — — —

(এই সারণি আই. বি. তথ্যের ভিত্তিতে লেখক তৈরি করেছেন) দেখা যায় যে, ফরিদপুর জেলা ছাড়া ২৪ পরগনা, বীরভূম, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় লীগের সদস্যসংখ্যা দু বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এইভাবে গ্রামবাঙলায় লীগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

এই সময় বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টির জন্য প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল। "শ্রীপদ্ম" চিহ্নকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। এই চিহ্নকে মূর্তিপূজার প্রতীক আখ্যা দিয়ে মুসলমান বিধায়করা বিধান-সভায় তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। এই প্রতীক বাতিলের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠানকে বয়কট করতেও দ্বিধা করে নি। ম্যাট্রিকুলেশন ও ইনটার-

মিডিয়েট বাঙলা সিলেবাস নিয়েও লীগ বিধায়করা মন্ত্রিসভাকে আক্রমণ করেন। সাম্প্রদায়িক ভাবধারা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিচারক" ও "পূজারিনি" কবিতার বিষয়ও আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। লীগ-সদস্যরা "বিচারক" কবিতার এই অংশটি আপত্তিজনক বলে উল্লেখ করেন—

কহে রঘুনাথ
আমার পথ রুধিলে হঠাৎ
চলেছি করিতে যবন নিপাত
যোগাতে যমের খাদ্য।

"পূজারিনি" কবিতার এই অংশটিও তাঁরা আপত্তিজনক বলে রায় দেন—

বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার,
এই কটি কথা জেনো মনে সার,
ভুলিলে বিপদ হবে।[২৩]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিনডিকেট গঠনের পদ্ধতি নিয়েও তুমুল সমালোচনা হয়। মুসলমান বিধায়করা অভিযোগ করেন যে, সিনেটে ১০০ জন এবং সিনডিকেটে ৭০ জন সদস্যের মধ্যে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা মাত্র ২১ জন করে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে একমাত্র মুসলমান উপাচার্য হন হোসেন শহীদ সোহরাবর্দি। ১৮০ জন করণিকের মধ্যে মুসলমান করণিক ছিলেন মাত্র ২ জন। তাঁদের আরো অভিযোগ ছিল যে, ৮৮ জন অধ্যাপকের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।[২৪] মুসলমান বিধায়করা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো বেশি সংখ্যায় মুসলমান শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের দাবি জানান। বিধানসভায় এই ধরনের আলোচনার ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী মনোভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে হিন্দুদের মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দুদের প্রাধান্য খর্ব করতে সচেষ্ট। আসলে, এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বাড়তে থাকে। ফলে, চাকুরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির জন্য ক্রমশ সরব হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সুযোগসুবিধা-প্রাপ্ত হিন্দুরা মুসলমান সমাজের এই অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। মুসলমান সমাজের এই অগ্রগতিকে মানসিকভাবে তাঁরা মেনে নিতেও পারছিলেন না। প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা মুসলমান সমাজের এই অগ্রগতিকে বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়। ফলে, মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলিকে হিন্দুরা নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করতে থাকে। প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা বাস্তব অবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগায় হিন্দুদের কাছে এই মন্ত্রিসভা সাম্প্রদায়িক বলে মনে হতে থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীকে সমমানে আনার জন্য বিশেষ কতগুলি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা এই নীতিই অনুসরণ করে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায়ও এই একই কারণে এই মন্ত্রিসভাকে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। তাই তারা ধীরে-ধীরে লীগের প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সচেতনতা বৃদ্ধির প্রধান হোতা ছিলেন ফজলুল হক। তাই অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বলেছেন, 'forced into the arms of the Muslim League, Fazlul Huq did perhaps more than anybody else in India to restore the prestige of the League and win for its support among the masses of the land. Thus an awakened mass consciousness contributed to the growth of popularity for the League.'[২৫] লীগ-নেতারা ফজলুল হকের প্রগতিশীল চিন্তাধারা আর বাঙালিয়ানা পছন্দ করতেন না। কিন্তু লীগ তাঁরই সাহায্যে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর লীগ-নেতারা তাঁকে দল থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন, বিভিন্নভাবে হেয় করারও ষড়যন্ত্র করেন। ফজলুল হকের জীবনের এই হল চরম ট্র্যাজেডি।

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা জনপ্রিয় হলেও, প্রজা-পার্টির মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখা দেয়। মন্ত্রিসভায় দপ্তর বণ্টন, লীগ মন্ত্রীদের কার্যকলাপ, মন্ত্রীদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি না মেনে মোটা বেতন গ্রহণ, জমিদারি প্রথা বাতিলে ব্যর্থতা ও অন্যান্য কারণে প্রজাপার্টির সদস্যদের মধ্যেই ক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁরা এই ব্যর্থতার জন্য ফজলুল হককেই দায়ী করেন।[২৬] প্রজাপার্টির অন্যতম নেতা শামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ২০ জন প্রজাপার্টি বিধায়ক ফজলুল হককে অভিযুক্ত করেন। এই কারণে ফজলুল হক ১৭ জন বিধায়ককে দল থেকে বের করে দেন। ফলে আরো কয়েকজন বিধায়ক দলত্যাগ করেন। ফজলুল হক এই অবস্থায় বিধানসভায় লীগের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, লীগের সাম্প্রদায়িক নীতির সঙ্গে আপোস ছাড়া মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। প্রাক্-নির্বাচনী আলোচনার সময়ে তিনি জিন্নার পক্ষ ত্যাগ করলেও, এখন পরিবর্তিত অবস্থায় জিন্নার সাহায্য ছাড়া এই মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব—একথা ফজলুল পরিষ্কার বুঝতে পারেন। এ হল তাঁর অস্তিত্বের সংকট। তাই লীগের লখনউ অধিবেশনে (১৯৩৭) পানজাবের মুখ্যমন্ত্রী সিকন্দর হায়াত খানের সঙ্গে ফজলুল হক লীগে যোগ দেন। দলীয় সংগঠনকে আরো মজবুত করার কাজে এই দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য অযাচিতভাবে জিন্না পেয়ে যান। এই অধিবেশনে ফজলুল হক ঘোষণা করেন, 'I submit to my leader Mr. Jinnah for all my future work and assure him that I shall abide by his decision....I have entirely thrown myself at the disposal of Mr. Jinnah'.[২৭] লীগে যোগদান করলেও ফজলুল হক কংগ্রেসের নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। পরে তিনি তাঁর সঙ্গে বাঙলাদেশে প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।[২৮] সুভাষচন্দ্র বসু প্রথমে এই বিষয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করেন। আবুল কালাম আজাদও আলোচনার কোনো একটি স্তরে যোগ দেন।[২৯] কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যরা মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। এই অবস্থায় লীগ সমর্থকরা প্রস্তাবটিকে বানচাল করার জন্য সচেষ্ট হন। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে উগ্র লীগপন্থীরা প্রজাপার্টির নেতা অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হেনস্থা করে। উগ্র লীগ-সমর্থকরা প্রয়োজনে বিধানসভার রাস্তায় অন্যান্য দলের বিধায়কদের গতিরোধ করার পরিকল্পনা করে। ৮ই এবং ৯ই অগস্ট অনাস্থা প্রস্তাবটি আলোচনার দিন স্থির হয়। লীগ-সমর্থকরা এই দুদিন হরতাল ঘোষণা করে। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে অন্যান্য দলের বিধায়করা আগের দিন থেকেই বিধানসভা-ভবনে রাত কাটানোর জন্য প্রস্তুত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিধানসভায় কংগ্রেসদলের সহনেতা তুলসীচরণ গোস্বামী, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, মৌলভি তমিজদ্দিন আহমেদ, ডাঃ সানাউল্লা, জে. সি. গুপ্ত, রায়বাহাদুর জে. সি. সেন, রসিকলাল বিশ্বাস, আফতাব আলি, চারুচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রনাথ বর্মন, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি, আবু হোসেন সরকার, অতুলচন্দ্র কুমার ও আরো অনেকে। মন্ত্রিসভার সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার ভয়ে বিরোধী সদস্যদের বিধানসভা ভবনে-রাত কাটানোর ঘটনা সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম। ৮ই অগস্ট সকাল থেকেই হাজার-হাজার

লীগ-সমর্থক তৎকালীন বিধানসভাভবন টাউন হলের সামনে জড়ো হয়। তখন বিধানসভা বসত বিকেলে। যোগাযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি ১৩০—১১০ ভোটে পরাস্ত হওয়ায় লীগ-সমর্থকরা উল্লসিত হয়ে ওঠে।[৩০] তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই যে, ইউরোপীয় দলের ২৩ জন সদস্যের ভোটে মন্ত্রিসভা অনাস্থা ভোটে জয়ী হয়। এখন থেকে প্রতিটি বিষয়ে প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা ইউরোপীয় দলের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ফজলুল হক আর সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল যে শ্রীবসু প্রজা লীগ মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারের অপসারণ চেয়েছিলেন। ফজলুল হক এই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সুভাষচন্দ্র বসু আর শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজীকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন নলিনীরঞ্জন সরকারকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। তবেই বাঙলায় প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারে।[৩১] ১৯৩৮ সালের ডিসেমবর মাসে গান্ধীজি সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখেন—

My dear Subhas Babu,

I must dictate this letter as I am willfully blind. Whilst I am dictating this, Maulana Sahib, Nalini Babu and Ghanasham Das [that is, Maulana Azad, Nalini Ranjan Sarkar and G. D. Birla] are listening. We have an exhaustive discussion over the Bengal Ministry. I am more than convinced that we should not aim at ousting the Ministry. We shall gain nothing by a reshuffle, and probably, we shall lose much by including Congressmen in the Ministry. I feel, therefore, that the best way of securing comparative purity of administration and a continuity of a settled programme and policy would be to aim at having all the reforms that we desire, carried out by the present Ministry. Nalini Babu should come out, as he says he would, on a real issue, being raised and the decision being taken by the Ministry against the interests of the country. His retirement from the Ministry would then be dignified and wholly justified ....[৩২]

Yours sincerely
M. K. Gandhi

এই চিঠি পেয়ে বিস্মিত সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সালের ২১শে ডিসেমবর গান্ধীজিকে লেখেন,

My dear Mahatmaji,

The letter which Sjt. G D. Birla brought from Wardha came as a profound shock to me. I remember to have discussed the Bengal situation with you time and again......My brother Sarat also discussed the matter with you. Both of us have the clear impression that you have already agreed with the idea of a Coalition Ministry for Bengal. I do not know what has happened since I left Wardha to make you alter your view so completely that you now write "I am more than ever convinced that we should not aim at ousting the Ministry etc." The papers say that after I left Wardha, Sjt. N. R. Sarkar, Sjt. G. D. Birla and Moulana Azad Saheb have seen you. Evidently you have altered your view after talking to them. The position, therefore, is that you attach more value and importance to the views of those three gentlemen than to the views of those who are responsible for running the Congress organisation in Bengal ......I hold, on the contrary, that it is imperative in the national interest that we should pull down the Huq Ministry as early as possible. The longer the reactionary Ministry remains in office, the more communal will the atmosphere of Bengal become and weaker will the Congress grow vis-a-vis the Muslim League......Your influence is going to be used not to get Nalini Babu to resign but to get him to stick to office at the time when even his closest friends want him to get out of the Huq Ministry. It has astonished me that you did not feel it necessary to even consult me before arriving at a decision on such a serious matter.[৩৩]

গান্ধীজির এই ব্যবহারের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। বর্তমানে লনডনবাসী নীরদচন্দ্র চৌধুরী সেই সময়ে শরৎচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত সচিব থাকায় বসু-ভাইদের সমস্ত চিঠিপত্র তদারকি করতেন। শ্রীচৌধুরীর মনে হয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন কেন জি. ডি. বিড়লা এই বিষয়ে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করছেন। বাঙলায় যদি প্রস্তাবিত প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হত, তবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপিত হলে এখানে মাড়োয়ারিদের স্বার্থ আর অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিঘ্নিত হত। এই বিপদের আশঙ্কা করেই ঘনশ্যামদাস বিড়লা গান্ধীজির শরণাপন্ন হন। ব্যক্তিগতভাবে নীরদচন্দ্র চৌধুরী মনে করেন যে, গান্ধীজি স্বেচ্ছায় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মতে, গান্ধীজি ব্যক্তিগতভাবে ও রাজনৈতিক কারণে সুভাষচন্দ্র বসুর ও সাধারণভাবে বাঙালিদের স্বার্থের বিরোধী ছিলেন।[৩৪]

কংগ্রেস ছাড়া বাঙলায় হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভার কট্টর সমালোচক ছিলেন। তিনি এই মন্ত্রিসভাকে ‘সাম্প্রদায়িক’ আখ্যা দিয়ে এর তীব্র সমালোচনা করেন। অন্যদিকে গ্রামবাঙলায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। অনেক জায়গায় লীগ-সমর্থকরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে হিন্দু মেলা ও হাটগুলিতে পাহারা দেওয়া শুরু করে। এই স্বেচ্ছাসেবকেরা মুসলমানদের হাট ও হিন্দু মেলাগুলিতে না যাওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করে। ফলে হিন্দুরাও পালটা ব্যবস্থা নেওয়ায়, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। এই সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা ক্রমশ খেলাধুলার ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হয়। কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ফুটবল দলের নেতৃত্বে অন্যান্য মুসলমান দলগুলি ভারতীয় ফুটবল সংস্থায় (I.F.A.) হিন্দু দলগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের দাবি জানায়।[৩৫] আই. এফ. এ. এই দাবি অগ্রাহ্য করায়, কলকাতার মুসলমান সমাজ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দিয়ে ময়দানের সমস্ত ফুটবল খেলা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এই অবস্থায় বাঙলা সরকারের মুখ্যসচিব হস্তক্ষেপ করেন। তাঁর নির্দেশে কলেক্টর অব কাস্টমস, বিধানসভার স্পীকার ও হাইকোর্টের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়ে একটি সালিশি কমিটি তৈরি হয়।[৩৬] কিন্তু আই. এফ. এ. এই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করায় তুমুল আলোড়ন আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কলকাতার মুসলমান সমাজ হিন্দু-প্রভাবিত ফুটবল সংস্থাকে এই অন্যায়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী করে।

এই সময়ে মন্ত্রিসভার লীগ মন্ত্রীদের সঙ্গে ফজলুল হকের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে ওঠে। নলিনীরঞ্জন সরকার দুই দলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাঙলার মন্ত্রিসভা ব্রিটিশ সরকারকে নিঃশর্তভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নলিনীরঞ্জন সরকার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে তিনি মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘...The cabinet has lost its initiative. The party has become supreme with the result cool deliberation and mature

judgement possible in the Council of Ministers have yielded place to the rashness and selfish predilections of a large party which is predominantly communal in complexion…'[৩৭] তাঁর এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ফজলুল হকের 'সুখী পরিবারে' বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

নলিনীবাবুর পদত্যাগের ফলে সোহরাবর্দি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে লীগ ও ইউরোপীয় বিধায়কদের সাহায্য ছাড়া মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ায়, ফজলুল হক আরো বেশি করে লীগ ও ইউরোপীয়দের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। এই সময়ে লীগের লাহোর অধিবেশন (১৯৪০) শুরু হয়। ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙলা থেকে ৪০০ সদস্যের একটি দল এই অধিবেশনে যোগ দেয়। জিন্না ফজলুল হককে কখনই বিশ্বস্ত বলে মনে করতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে ফজলুল হক বাঙলায় খুবই জনপ্রিয়। হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায় তাঁকে নিজেদের লোক বলে বিশ্বাস করতেন। তাই সুতরাং জিন্না হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ফজলুল হককে দিয়েই "পাকিস্তান প্রস্তাব" পেশ করান। সহজ, সরল ও ভাবাবেগে আপ্লুত ফজলুল হক জিন্নার এই রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক চাল বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝতে পেরেছিলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফজলুল হকের মতো একজন পোড়খাওয়া রাজনৈতিক নেতা কিভাবে জিন্নার এই ফাঁদে ধরা দিলেন, তা আমাদের কিছুতেই বোধগম্য হয় না। লাহোর অধিবেশনকে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের ক্লাইম্যাক্স বলা যায়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রবক্তা ফজলুল হকের মুখ দিয়েই জিন্না প্রকাশ্য অধিবেশনে বলালেন যে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান চাই। এটাই হল ফজলুল হকের জীবনের চরম ট্রাজেডি।

হক-জিন্না মতবিরোধ ও ফজলুল হকের ২য় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-৪৩) গঠন

বাঙলার রাজনীতিতে এই সময়ে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। একদিকে ছিলেন ফজলুল হক স্বয়ং ও তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টি আর অন্যদিকে জিন্নার অনুগত সোহরাবর্দি, নাজিমুদ্দিন আর ইসপাহানির সমর্থক গোষ্ঠী। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর হাতেই ছিল লীগের নেতৃত্ব। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল বলে এই দিনটি "পাকিস্তান দিবস" হিসাবে লীগ-সমর্থকরা পালন করত। বাঙলায় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ফজলুল হক আর সোহরাবর্দি এই অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখার জন্য লীগের সমস্ত শাখাগুলিতে নির্দেশ পাঠান। সরকারের ওরফেও নির্দেশনামা জারি করা হয়।[৩৮] এই নির্দেশকে অমান্য করে কলকাতা জেলা মুসলিম লীগ মহম্মদ আলি পার্কে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ফলে ফজলুল হক ক্ষুব্ধ হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, লীগ-সদস্য আর সমর্থকরা তাঁর নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে সচেষ্ট। এই সময়ে জিন্নার অনুগত সদস্যগোষ্ঠীর সঙ্গে হকের সম্পর্ক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জিন্নার সঙ্গেও তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয়। ভাইসরয় লিনলিথগো জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে (National Defence Council) বাঙলা পানজাব আর আসামের তিন প্রধানমন্ত্রীকে সদস্য নিয়োগ করেন। জিন্না সমস্ত সদস্যদের পদত্যাগের নির্দেশ দেন। আসামের আর পানজাবের প্রধানমন্ত্রীরা, যথা সাদুল্লা খাঁ ও সিকন্দর হায়াৎ খাঁ, জিন্নার নির্দেশ পালন করেন। লীগ কমিটি ফজলুল হককে পদত্যাগ করার জন্য দশ দিন সময় দেয়। দশ দিন পরেও ফজলুল হক পদত্যাগ না করলে, জিন্না তাঁর বিরুদ্ধে দলের শৃঙ্খলা ভাঙার জন্য শাস্তি দেবার কথা

ঘোষণা করেন। ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ফজলুল হক কাগজে বিবৃতি দেন: 'I have made it perfectly clear that Mr. Jinnah's decision to take disciplinary action against me was wholly unconstitutional, that for the use of this sort of arbitrary powers Mr. Jinnah had no justification. I have also made it clear that Mr. Jinnah never heard of our statements and that his decision was exparte.'[৩৯] এই বিবৃতি দিয়ে তিনি জিন্নার নেতৃত্বকে চ্যালেনজ জানান। বাঙলার জিন্নাপন্থী লীগ-নেতারা ফজলুল হকের এই বিবৃতিটিকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, তাঁকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বোম্বাইয়ে লীগের আলোচনাসভায় তিনি যোগ দিতে পারেন নি। টেলিফোনে তিনি জানান যে ইতিমধ্যে নতুন কিছু তথ্য জানা গিয়েছে তিনি সেগুলি পরীক্ষা করে তবেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেবেন।[৪০] তিনি জানতে পারেন যে বোম্বাইয়ের গভর্নর স্যার রজার লুমলি জিন্নাকে অন্তত একদিন আগে (২০শে জুলাই) এক "বিশেষ ব্যক্তিগত" চিঠিতে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে কারা সদস্য হবেন জানিয়েছিলেন।[৪১] সুতরাং জিন্না অন্তত একদিন আগেই জানতে পারেন যে কারা সদস্য নিযুক্ত হবেন, কিন্তু তিনি লীগের সদস্যদের কোনোরকম নির্দেশ দেন নি। এজন্য ফজলুল হক জিন্নার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জিন্নার একনায়কের মতো ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ ও লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

বাঙলায় জিন্নার সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন আর নির্ভরযোগ্য লোক ছিলেন ইসপাহানি। জিন্না ইসপাহানিকে ফজলুল হকের উপর নজর রাখতে নির্দেশ দেন। তিনি জিন্নাকে জানান যে, এই সময় ফজলুল হক 'showed lip-loyalty to the League'.[৪২] জিন্নার সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্য সোহরাবর্দি, নাজিমুদ্দিন, মৌলানা আকরম খাঁ ও অন্যান্যরা ফজলুল হককে সরিয়ে নিজেদের অনুগত ও বিশ্বাসভাজন কাউকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। মন্ত্রিসভার লীগমন্ত্রীদের সঙ্গে ফজলুল হকের তিক্ততা চরমে পৌঁছয়। তাঁকে সামনে রেখে লীগ-মন্ত্রীরা নিজেদের দলীয় স্বার্থের জন্য কাজ করছিলেন। ফজলুল হক বুঝতে পারেন যে, পটুয়াখালির নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনের পরাজয়ের গ্লানি অনেকেই ভুলতে পারে নি, তাই তাঁকে সরাবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তাঁর অজান্তে অনেক অর্থ বাজেটে অনুমোদন করিয়ে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে সদস্যপদ গ্রহণের জন্য দুজন প্রভাবশালী লীগ-মন্ত্রীর গোপন নির্দেশে কলকাতায় ফজলুল হক -বিরোধী সভার আয়োজন করা হয়।[৪৩] ফজলুল সবই জানতে পারেন। তাই তিনিও গোপনে প্রস্তুত হন। তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসু এবং তফসিলি হিন্দু নেতাদের সঙ্গে গোপনে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। শরৎচন্দ্র বসুর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে ফজলুল হক এই দলের নেতা নির্বাচিত হন। গোপন চিঠিতে জিন্নাকে সব জানিয়ে ইসপাহানি মন্তব্য করেন: 'The fight is on. It will be a life and death struggle. Huq, by no means, is a spent force. He has influence and a following. The Hindus are almost daily with him'.[৪৪]

অন্যদিকে লীগ-নেতারা এক গোপন বৈঠকে স্থির করেন যে, মন্ত্রিসভার চারজন লীগসদস্য—খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহরাবর্দি, ঢাকার নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর এবং তমিজুদ্দিন খাঁ মন্ত্রিসভা থেকে একসঙ্গে পদত্যাগ করবেন। আরো ঠিক হয় যে, 'ফজলুল হক কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার কাছে আত্মসমর্পণ করে

মুসলমানদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন', "ইসলাম আজ বিপন্ন" প্রভৃতি অভিযোগ বিভিন্ন সংবাদপত্র লিফলেট ও পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হবে।[৪৫] পরিকল্পনা অনুযায়ী ৮ই ডিসেমবর চারজন লীগ-মন্ত্রী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে ফজলুল হকও পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। লীগ নেতারা অঙ্ক কষেছিলেন যে মন্ত্রিসভার পতনের পর, গভর্নর নতুন মন্ত্রিসভা তৈরির জন্য খাজা নাজিমুদ্দিনকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এইভাবে জিন্না-বিরোধী ফজলুল হকের বদলে জিন্নার অনুগত নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।[৪৬]

এদিকে ১১৯ জন বিধায়ককে নিয়ে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের ২৫ জন বিধায়ক ঘোষণা করেন যে, বিধানসভায় তাঁরা এই দলকে সমর্থন করবেন।[৪৭] জাতীয়তাবাদী স্বতন্ত্র হিন্দুরাও এই দলকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতা হিসেবে গভর্নর ফজলুল হককে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ১১ই ডিসেমবর ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শপথ গ্রহণ করেন, সঙ্গে ছিলেন ঢাকার নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর। মতান্তর হওয়ায় তিনি লীগ ছেড়ে কোয়ালিশন পার্টিতে যোগ দেন। লীগ-নেতারা তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে, দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁকে দল থেকে বের করে দেন।

কেন লীগের নেতারা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে এত আশান্বিত ছিলেন? লীগ-নেতারা অনুমান করেছিলেন যে, মন্ত্রিসভা ভেঙে যাওয়ার পর গভর্নর বিরোধী নেতা শরৎচন্দ্র বসুকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। এই অবস্থায় শরৎচন্দ্র বসু এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেও পারেন, আবার নাও রাজি হতে পারেন। তাঁদের মনে হয়েছিল যে শরৎচন্দ্র বসু এই প্রস্তাব গ্রহণ না করে গভর্নরকে ফজলুল হককে আমন্ত্রণ করতে অনুরোধ করবেন। লীগের নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, গভর্নর ফজলুল হককে শরৎচন্দ্র বসুর অনুরোধ অনুযায়ী আমন্ত্রণ করবেন না। কারণ কয়েকদিন আগেই ফজলুল হক ঘোষণা করেন যে তিনি নূতন দলের নেতা নন। এই অবস্থায় গভর্নর নাজিমুদ্দিনকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী লীগ-মন্ত্রীরা ফজলুল হকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ১৯৪১ সালের ১৪ই ডিসেমবরের চিঠিতে নাজিমুদ্দিন জিন্নাকে লেখেন,

'.....break with Fazlul Huq took place with practically the tacit approval of His Excellency and we were given to understand that when the Coalition Party elec'ed the new leader, I would be sent for.....'

নাজিমুদ্দিন কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতা করতে চান। তিনি এ বিষয়ে জিন্নার অনুমতি চান। জিন্না এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য সবুজ সংকেতও দেন। তিনি হকের বিরোধী প্রজা-পার্টির বিধায়কদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু এই সময়ে যুদ্ধ-পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হওয়ায় গভর্নর নাজিমুদ্দিনকে ফজলুল হকের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে অনুরোধ করেন। গভর্নর কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চান নি, তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নেতা ফজলুল হককে তিনি মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। এইভাবে লীগ-নেতাদের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

ফজলুল হকের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা তৈরির পর, জিন্না তাঁকে দলবিরোধী কাজের জন্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাবদিহি করার নির্দেশ দেন। ফজলুল হক এত কম সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে অক্ষমতা জানান। ১০ই ডিসেমবর জিন্না ফজলুল হকের লীগের প্রাথমিক সদস্যপদ খারিজ করে দেন। জিন্নার এই সিদ্ধান্ত লীগের নাগপুর অধিবেশনে (ডিসেমবর, ১৯৪১) অনুমোদিত হয়। এখানে জিন্না মন্তব্য করেন,

'I make another new year's gift of the Nawab of Dacca to the Governor of Bengal. I am very glad and I am happy that Muslim India is rid off these men (Fazlul Huq and Nawab of Dacca) who are guilty of the grossest treachery and betrayal to the Muslims.'[৪৮]

জিন্না ফজলুল হকের ব্যবহারে এত ক্ষুব্ধ ছিলেন যে ব্যক্তিগত কথাবার্তায়ও এই ক্ষোভ বোঝা যেত। তিনি নতুন দিল্লীর বাসভবনে কোনো এক সময় ইসপাহানিকে বলেন,

'Fazlul Huq and Sikandar Hyat Khan are a menace not only to the Muslim League but to the Muslim Nation. Each time the dish is cooked and is about to be served to the Muslim Nation, they knock it down to the mud and ruin much labour and planning which has gone into its preparations.'[৪৯]

ফজলুল হক দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর জিন্নার স্বৈরাচারী ব্যবহারের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলা বেশ কিছুদিন চলে। পরে ফজলুল হক মামলা প্রত্যাহার করে নেন। ফজলুল হক আর জিন্নার মতপার্থক্যের কারণ রাজনৈতিক হলেও, দুজনের ব্যক্তিত্বের সংঘাতও অন্যতম কারণ ছিল। জিন্না মনে করতেন যে, সমস্ত মুসলমান নেতা তাঁর প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখাবেন। অন্যদিকে ফজলুল হক বাঙালি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করতেন। বাঙলার রাজনীতিতে তিনি উর্দুভাষী উত্তর ভারতের লীগ-নেতাদের আধিপত্য সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বারবার মনে হয়েছে যে লীগ-নেতারা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সুবিধা আদায়ের জন্য মুসলমান-সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাঙলাদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন। এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার জন্যই তিনি বারবার সর্বভারতীয় লীগ-নেতাদের অযৌক্তিক নীতির সমালোচনা করে লীগ-নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়েছেন।

ফজলুল হক ভারতীয় রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার কার্যভার নেন। কংগ্রেস ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুত। হক মন্ত্রিসভা এই আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর নীতি গ্রহণের পক্ষে না থাকলেও, ইংরেজ শাসকের দমননীতি মেনে নিতে বাধ্য হয়। মেদিনীপুর জেলা "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তমলুকে কংগ্রেস জাতীয় সরকার গঠন করে প্রায় চার বছর ধরে সমান্তরাল সরকার কার্যকর রাখে। ইংরেজ সরকার মেদিনীপুরে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে নৃশংস পুলিসি অত্যাচার চালায়। বিধানসভায় অনেক বিধায়ক একসঙ্গে মেদিনীপুরে পুলিসি অত্যাচারের জন্য তদন্তের দাবি জানান। এই অবস্থায় ফজলুল হক বিধানসভায় তদন্তের আশ্বাস দেওয়ায়, গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ১৫ই ফেবরুয়ারি ফজলুল হককে অশোভন ভাষায় একটি চিঠিতে লেখেন,

'You have given to-day in the Legislature an undertaking for an enquiry into the conduct of officials in the district. You are well aware that this subject attracts my special responsibilities and you are also aware of my views on the undesirability of enquiries into the matter...I shall expect an explanation from you at your interview tomorrow morning of your conduct in failing to consult me before announcing what purports to be the decision of the Government.'[৫০]

১৬ই ফেবরুয়ারি ফজলুল হক প্রত্যুত্তরে গভর্নরকে লেখেন,

'It appears from your letter that you are not prepared to give your consent to the constitution of a committee of enquiry. If so, the only way left open to me is to make a statement in

the House in which I shall endeavour to explain that my statement made yesterday should not be taken as a commitment on the part of the Government to a committee of enquiry, and that I propose to read out to the House your letter under reply so as to explain my position.'[৩১]

এর ফলে গভর্নরের সঙ্গে ফজলুল হকের সম্পর্কের অবনতি হয়। মেদিনীপুরে পুলিসি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে অর্থ দপ্তরের দপ্তরের মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে তিনি তীব্র ভাষায় গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ও উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের তীব্র সমালোচনা করেন। এ ছাড়া, অন্যান্য কারণেও গভর্নরের সঙ্গে ফজলুল হকের সম্পর্কের অবনতি হয়।

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করেন। কয়েকটি বিষয়ে তিনি মন্ত্রীদের উপেক্ষা করে সরাসরি বিভাগীয় সচিবদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করে বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের যুগ্মসচিবকে পূর্ববাংলার কয়েকটি জেলা থেকে খাদ্যশস্য সরিয়ে নেবার আদেশ দেন।[৩২] যুগ্মসচিব এই কাজের জন্য জনৈক ঠিকাদারকে ২০ লাখ টাকা অগ্রিম দেন। যুদ্ধের কারণে ইংরেজ সরকার পূর্ববাঙলা থেকে সমস্ত নৌকা ও জলযান-গুলিকে সরিয়ে নেবার আদেশ দেন (Boat Removal Policy)। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়াই আমলাদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে গিয়ে পূর্ববাঙলার অসংখ্য মানুষকে অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। মন্ত্রী এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন, কিন্তু গভর্নর এই প্রতিবেদনটিকে ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো সৌজন্যটুকুও দেখান নি। হোমগার্ড নিয়োগবিধি, A. R. P.-তে মুসলমানদের নিয়োগ এবং যথেচ্ছভাবে 'ভারতরক্ষা' আইনের প্রয়োগ নিয়েও গভর্নরের সঙ্গে ফজলুল হকের মতপার্থক্য দেখা দেয়।[৩৩] এই সময়ে তিনি ফজলুল হককে ডেকে প্রস্তাব দেন যে, হকের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা তাঁর ইচ্ছা, তাই ফজলুল হক যেন দেশের আপৎকালীন অবস্থা দেখে পদত্যাগ করেন। না করলে তিনি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করবেন। এই অবস্থায় ফজলুল হক গভর্নরের নির্দেশে টাইপ-করা পদত্যাগপত্রে সই করতে বাধ্য হন। গভর্নরের ষড়যন্ত্রে এইভাবে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো হয়।[৩৪] বাঙলার গভর্নরের ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করে ভাইসরয় লিনলিথগো ভারতসচিব লর্ড অ্যামেরিকে লেখেন,

'I am very disturbed about this business of Herbert. I am sure it is more dangerous for Governors to play politics even if they are of outstanding capacity, and I fear that poor Herbert can hardly claim to be of the latter category. My confidence in him has never, as you know, been great, but this incident has administered a severe further shock to it, and I have as you will see felt obliged to send him a pretty stiff letter, though of course I accept the necessity for protecting his position and saving his face'[৩৫]

ভাইসরয় লিনলিথগো এই অন্যায়ের প্রতিকার করার কোনো চেষ্টাই করেন নি, বরঞ্চ জন হার্বার্টকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হন।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার পতন গভর্নর জন হার্বার্টের ইচ্ছায় হয়েছিল বলে ভাবলে ভুল করা হবে। তৎকালীন ইউরোপের যুদ্ধকালীন অবস্থা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের চমকপ্রদ সাফল্য এবং নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠনের পটভূমিকায়, ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার পতনের কারণ নিহিত ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের সহযোগিতায় ভারত অভিমানে প্রস্তুত। অন্যদিকে ফরোয়ার্ড ব্লকের সন্তোষকুমার বসু এবং প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হক মন্ত্রিসভার সদস্য। বিধানসভায় ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থকরা লীগের বিরুদ্ধে এই মন্ত্রি-সভার সমর্থক। এই মন্ত্রিসভাকে যে-কোনো অজুহাতে বাতিল করতে গভর্নর সচেষ্ট হন এবং মেদিনীপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করেন।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের হাতে মিত্রশক্তির পরাজয় এবং পার্লহারবারের পতন ইংরেজ সরকারের চিন্তার কারণ হয়। রেঙ্গুন দখলের পর জাপান ভারত আক্রমণে উদ্যত হয়। লক্ষণীয় যে, ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ, অর্থাৎ মন্ত্রিসভা পতনের দুদিন পর, ঘোষণা করা হয় যে বাঙলাদেশ 'Red Area' অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে আকাশপথে বাঙলা-দেশ আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।[৩৬] ভারত সরকারের তরফে জানানো হয় যে, সম্ভাব্য যুদ্ধের কারণে অসামরিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শিথিল করা যাবে না। এই সময়ে ফজলুল হকের মতো স্বাধীনচেতা প্রধানমন্ত্রী থাকলে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়নে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তাই ইংরেজদের অনুগত কোনো প্রধানমন্ত্রী থাকা প্রয়োজন, আর নাজিমুদ্দিন তো ইংরেজদের নয়নের মণি। এই অবস্থায় এটা ধরেই নেওয়া যায় যে, ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে, লীগের নেতা নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। গভর্নর শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি কৌশলে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার পতন ঘটান।

তৃতীয়ত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক দিক দিয়েও বাঙলার গুরুত্ব বেড়ে যায়। কারণ এখানেই ছিল কয়লার খনি ও অর্ডনান্স ফ্যাকটরিগুলি। বাঙলার সামরিক গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার মেয়াদ কমতে থাকে। 'ফজলুল হককে যেতেই হবে'—এ সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেওয়া হয়েছিল। তাই সুযোগ পাওয়া মাত্র গভর্নর সুকৌশলে ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তথ্যসংকেত

১. Fortnightly Reports on the political situation in Bengal for first half of May, 1936, Govt. of Bengal, Home (Political).

২. Ispaan i, *Qaid e Azam Jinnah as I Knew Him*, Karachi, 1966, page 27-28.

৩. Ibid, p 31.

৪. Ibid.

৫. Rahim Abdur Mohammad, *The Muslim Society ana Politics in Bengal, 1757—1947*, Dacca, 1978, p 249-250.

৬. Fortnightly Reports for first half of September, 1936, Govt. of Bengal, Home (Political).

৭. De Amalendu, *Islam in Modern India*, Calcutta, 1982, p 214.

৮. Rahim Abdur Mohammad, op. cit, p 257.

৯. দে অমলেন্দু, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ ৩২।

১০. Fortnightly Reports for first half of February, 1937, File No. Feb/10/37, Govt. of Bengal, Home (Political).

১১. Amrita Bazar Patrika, 12 July, 1941, p 7.

১২. Rahim Abdur Mohammad, op. cit, p. 254.

১৩. এই কমিশনের সদস্যরা ছিলেন (১) স্যার ফ্রানসিস ফ্লাউড, (২) বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাব, (৩) এম. ও কার্টার, (৪) খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জমুদ্দিন, (৫) মৌলভি হাসেম আলি, (৬) খান বাহাদুর এম. এ. মোমিন, (৭) ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং (৮) এফ. এ. শ্রুসে।

১৪. Sen Shila, *Muslim Politics of Bengul, 1936-1947*, New Delhi, 1976.

১৫. *Two years of Provincial Autonomy*—A Report on the work done by the Govt. of Bengal from 1st April, 1937 to 31st March, 1939, Govt. of Bengal, Publicity Department, p 10.
১৬ Bengal Legislative Assembly Proceedings, 1940, part—XXXXXVII, No. 5, p 114.
১৭. Amrita Bazar Patrika, 19 August, 1940.
১৮. Ibid, 22nd December, 1940.
১৯. B. L. A. P., Part 57, No. 2, p 469.
২০. Nomination to Local Bodies, Decision of the Council of Ministers, 1939, Home (Pol.), File No. 179/39.
২১. Secret Letter of Mr. M. O. Martin, Commissioner, Chittagong Division, to Mr. E. N. Blandy, Chief Secretary to the Govt. of Bengal, Home (Pol.), D.O. No.—421/C, dt. 30 April, 1939, File No. 15/42.
২২. Ibid.
২৩. B.L.A.P., 1938, Part—53, No.—4 p 297.
২৪. Ibid.
২৫. Kabir Humayun *Muslim Politics and Other Essays, 1906 –1942*, Calcutta, 1969, p 32.
২৬. Sen Shila, op. cit., p 98.
২৭. Amrita Bazar Patrika, 17 October, 1937.
২৮. Gordan A Leonard, *Bengal, the Nationalist Movement 1876—1940*, New Delhi, p 283.
২৯. Amrita Bazar Patrika, 26 July, 1938.
৩০. A brief summary of the political events in the Province of Bengal during the year 1938, Home (Pol.), Govt. of Benga , 1938. এছাড়া কালিপদ বিশ্বাসের 'যুক্তবাংলার শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।
৩১. Gordan A Leonard, op. cit., p 283.
৩২. Ibid.
৩৩. Ibid.
৩৪. Ibid p 285.
৩৫. Fortnightly Reports for the first half of May, 1940, Home (Pol.), Govt. of Bengal.
৩৬. Ibid.
৩৭. B.L A.P , Part=54, No.—2, 1939.
৩৮. Amrita Bazar Patrika, 26 March, 1941.
৩৯. Ibid, 16 August, 1941.
৪০. Wolpert Stanle, *Jinnah of Pakistan*, Oxford, 1984, p 192
৪১. Ibid.
৪২. De Amalendu, *Islam in Modern India*, p 157.
৪৩. Amrita Bazar Patrika, 7 December, 1941. ফজলুল হকের অভিযোগের এক বিরাট তালিকা পাওয়া যায়। কিভাবে মন্ত্রিসভার লীগ মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভার সংহতি নষ্ট করেছিলেন, ফজলুল হক তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।
৪৪. Ispahani, op. cit., p 50-51.
৪৫. Hindusthan Standard, 1 December, 1941.
৪৬. Ibid.
৪৭. Fortnightly Reports for first half of May, 1941, Home (Pol), Govt. of Bengal.
৪৮. Wolpert Stanley, op. cit, p 194.
৪৯. Ispahani, op. cit, p 58.
৫০. B. L. A. P., Part—LXV, p 53, 1943.
৫১. Ibid, Part—LXIV, p 54, 1943.
৫২. Ibid, Part—LXIV, p 46.
৫৩. Ibid, Part—LXIV, p 47-52.
৫৪. ফজলুল হকের পদত্যাগপত্র।
My dear John,
Understanding that there is a probability of the formation of a Ministry representative of most of the parties in the event of my resignation, I hereby tender my resignation of my office as Minister in the sincere hope that this will prove to be in the best interest of the people of Bengal.
Yours sincerely
A. K. Fazlul Huq
৫৫. Mansergh Nicholas, *Transfer of Power*, Vol—3, p 875-76.
৫৬. Hindusthan Standard, 31 March, 1943.

বোধন

এক

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ত্রাসটা ছড়িয়ে পড়ল ভিক্তিমিএগ্রা লাইনের অলিতে গলিতে। নদীর তীরবর্তী জুটমিল-সংলগ্ন বস্তিগুলোয় চিৎকার, আর্তনাদ, দোকানে-দোকানে ঝাঁপ বন্ধ, দেশী কুত্তাগুলোর কর্কশ শব্দ। দুমদাম কয়েকটা বোমার শব্দ হল। রাস্তার আলোগুলো সেই সময় জ্বলছিল না। লোডশেডিং চলছিল। হঠাৎ বেশ কিছুক্ষণ তীব্র চিৎকার।

গাড়িটা ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। পার্থপ্রতিম এবং আরও কয়েকজন সতর্ক মানুষ একটা বটগাছের নীচে ছেঁড়া-ছেঁড়া অন্ধকারে। আকাশের চাঁদ মেঘে ঢাকা। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল। কোথাও হয়তো বৃষ্টি হয়ে গেছে। এবার গাড়িটা ছুটে চলল এলোমেলো ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে। গাড়ির ভেতরে গাদাগাদি জনা ছয়েক।

পার্থপ্রতিম এতক্ষণে মুখ খুলল, 'থানায় চলো।' ড্রাইভার হঠাৎ জোরে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাল বাঁ দিকে। ভেতরে নিশ্চুপ মানুষগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল এ ওর ঘাড়ে। সন্ত্রাসের রেশ এখন বেশ অনেক দূরে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। পার্থপ্রতিম একটা সিগারেট ধরাল।

গাড়িটা শব্দ করে ব্রেক কষে দাঁড়াতেই একজন কনস্টেবল স্যালুট দিল। সিঁড়িতে পা রাখতেই থানার অফিসার-ইনচার্জ ছুটে এলেন, 'আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

পার্থপ্রতিম গম্ভীর মুখে করমর্দন করে জিজ্ঞেস করল, 'কালকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন করেছেন?'

'চিন্তার কিছু নেই'—ঘাড় নেড়ে জানালেন অফিসার-ইনচার্জ।

পার্থপ্রতিম একটু হেসে বলল, 'পশ্চিমের বস্তিগুলোয় একটা সন্ত্রাসের গন্ধ পেলাম। ব্যাপারটা একটু ম্যানেজ করবেন।'

অফিসার-ইনচার্জের চোয়াল দুটো শক্ত হল। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'দেখব।'

কাল ভোট। প্রচারপর্ব শেষ। বড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে পার্থপ্রতিম। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটায় গাড়িটা লাফাচ্ছিল।

'ইটস ইনডিড হুইসেন্স!' বিরক্ত পার্থপ্রতিমের মুখের দিকে বেশ কয়েকজোড়া চোখ স্থির।

আজকের অ্যাকশানটা মোটামুটি স্থির। পার্থপ্রতিম ভাবে—অ্যাকশান স্কোয়াডের ছেলেদের বলা আছে অপ্রয়োজনীয় খুন যেন না হয়। শুধুই সন্ত্রাস। কাল প্রয়োজন বুঝে ওই-সমস্ত বুথগুলোর দখল নিতে হতে পারে। বস্তির মানুষগুলো আজকাল উলটো মুখে ঘুরছে।

লালটু আর সফি। নাম দুটো মনে পড়তেই পার্থপ্রতিমের মুখটা কঠিন হল। গত সপ্তাহে স্বাতী সংঘের ময়দানে মিটিঙে বোমা মেরে মিটিং বানচাল করার চেষ্টায় ছিল। ভাবনার গভীরে ডুবে থাকা আনমনা দুটো চোখ সরে-সরে যাচ্ছিল দু-পাশের দোকানপাট, মানুষ বাড়ি সবকিছু পেছনে ফেলে।

দু পাশে টাঙানো দেওয়ালে লেখা ভোটের প্রচারপত্র, ফেস্টুন, হোর্ডিং। এবারের ইলেকশানে পার্টি ক্যানডিডেট সুজন চক্রবর্তী। সুজন একই ইয়ারে ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল। ইউনিভার্সিটির যুব পর্যায় থেকে উভয়েই ধাপে-ধাপে উঠেছে।

পার্থপ্রতিমের ওপর পার্টি সংগঠনের বিরাট দায়িত্ব এখন। গাড়িটা পার্টি অফিসের সামনে ব্রেক কষল। পার্টি অফিস জমজমাট। পার্থপ্রতিম আর সঙ্গের কজন যুবক টুকটাক নেমে পড়ল। একদল তরুণ পার্টির কতগুলো ব্যানার আর পোস্টার নিয়ে বেরিয়ে গেল। আজকে রাতের মধ্যেই ওগুলোকে টাঙাতে হবে নির্দিষ্ট জায়গায়।

পার্টি অফিসে ঢুকতেই সবাই হইহই করে অভ্যর্থনা জানাল। দুজন তরুণ এগিয়ে এসে বলল, 'সুজনদা আসছে না। আজ রাত্রে বাড়িতে আপনাকে খাবার কথা বলে গেছে।' একটা চিঠি এগিয়ে দিল তারা। সুজনের লেখা। পার্থপ্রতিম চিঠিটা চটপট খুলে পড়তে শুরু করে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। পার্টির কাজকর্ম দেখতে-দেখতে মনে-মনে অস্থির হয়ে পড়েছিল পার্থপ্রতিম। হঠাৎ বাইরে একটা অ্যামবাস্যাডর ব্রেক কষল। জনা আষ্টেক বেপরোয়া তরুণ বেরিয়ে এল। তাদের চোখগুলো জ্বলছিল। পার্থপ্রতিম ইশারায় তাদের ঘরের ভেতর যেতে বলল।

ভেতরে ঢুকতেই তিনজন যুবক চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিশ আমাদের হেল্প করে নি।'

পার্থপ্রতিমের ভ্রূ কুঁচকে উঠল, 'তার মানে?'

উদ্ধত এক তরুণ জবাব দিল, 'আমাদের অ্যাকশান চালাতে-চালাতে যখন একদম পশ্চিমের বস্তিগুলোর দিকে এগোচ্ছি তখন দেখি পুলিশের জীপ।'

আরও একজন বলল, 'হারামি ওসি চিৎকার করে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করল। পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।'

'লালটু আর সফির খবর কী?' চোখদুটো চকচক করে উঠল পার্থপ্রতিমের।

'না, ওদের ধরতে পারি নি। তবে খবর পেয়েছি ওরা নদীর দিকে পালিয়ে গেছে। পুলিশ না এলে আজ ও দুটোর লাশ আপনার পায়ে নজরানা দিতাম।'

ফোন তুলল পার্থপ্রতিম। চোয়াল দুটো শক্ত। 'আমি পার্থপ্রতিম মিত্র বলছি। অফিসার-ইনচার্জকে দিন।'

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, 'উনি জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।'

'আই ওয়ানট এনি ওয়ান অব ইউ।'

'বলুন, আমি সেকেনড অফিসার বলছি।'

'ওসি এলে বলবেন, পুলিশ সন্ত্রাসের মোকাবিলা ঠিকমতো করতে পারে নি।'

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। আপনি ভাববেন না।'

'স্টপ, স্টপ। আগে আমার কথা শুনুন। লালটু আর সফি এই দুজন অ্যানটিসোস্যালকে অ্যারেস্ট করেছেন?'

'না, তবে চেষ্টা করছি। হয়তো আজকে রাতেই—।'

'আই অ্যাম নট রেডি টু গেট দিস টাইপ অব ইনফরমেশান ফ্রম ইউ। রিয়েলি, আমি হোপলেস।'

'এক্সকিউজ মী।'

'শুনুন, ভালো করে শুনে নিন। আমি এখনই বেরোচ্ছি। মসজিদের কাছেই থাকব। আপনি আসবেন, একটু বস্তিতে ঢুকব। সঙ্গে দু-চারজন কনস্টেবল নিয়ে এলে ভালো হয়।' পার্থপ্রতিম শব্দ করে ফোনটা রেখে দিল। তারপর উত্তেজনায় হাঁপাতে-হাঁপাতে প্রশ্ন করল, 'এনি মার্ডার?'

'নাঃ—তবে জনা পাঁচেক উনডেড।' উদ্ধত যুবকদের একজন চটপট উত্তর দিল।

পার্থপ্রতিম গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে দুজন স্বাস্থ্যবান যুবক। তাদের কোমরে রিভলবার।

দুই

বাজারটার নাম টিনবাজার। মসজিদ-সংলগ্ন এলাকার তিন দিকে বাঁকা চাঁদের মতো ঘিরে এই বাজারটা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বাঙালি, অবাঙালির মিলমিশে এখানে সংস্কৃতির কোনো নিজস্ব চরিত্র নেই। রাজনৈতিক আবহাওয়ার সুস্থ আকাশ খুব কম দিনই বজায় থাকে এখানে। চারপাশে যেমন আছে ঝোপড়াপট্টি, অজস্র নোংরা গলি, তেমনি আছে পরিবেশের সঙ্গে বড়ো বেমানান প্রাসাদোপম বাড়ি। ভুঁইফোড় এখানকার অধিবাসীদের প্রায়ই পেতে হয় আকাশে বারুদের গন্ধ। সোজা পথের পয়সা এখানে ওড়ে খুবই কম। টিনবাজারের আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে-থাকা ছোটো-বড়ো আলোঝলমল বেশির ভাগ দোকানের পেছনে অন্যরকম অন্ধকারের ব্যাবসা চলে। জুয়ার চরকি চলে, বোর্ড বসে। হিস্যার ভাগাভাগি নিয়ে প্রায়ই চলে রক্তের হোলিখেলা। বাজারের অন্ধগলির আশেপাশে চলে দেশী চোলাই মদের আড্ডা। আশেপাশে গজিয়ে ওঠা কারখানার খেটে-খাওয়া শ্রমিকরা সারা মাসের আয় এখানে এসে ধীরে-ধীরে খোয়াতে-খোয়াতে এক সময় সর্বস্বান্ত হয়। হিস্যায়-হিস্যায় অবগাহন করতে-করতে এখানকার পুলিশের ভাগ্য খুলে যায় দু-পুরুষ অবধি। এখানকার এই সর্বস্বান্ত মানুষগুলোকে চেতনার আলোকে বাঁচাবার জন্য তেমন কোনো সংগ্রামের কথা ভাবায় নি কোনো রাজনৈতিক নেতাকেই ইতিমধ্যে। অথচ ট্রেড ইউনিয়নের দখলদারি নিয়ে দুটো রাজনৈতিক দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি এখানে খুবই পরিচিত ঘটনা।

গাড়িটা পৌঁছল মসজিদ-সংলগ্ন এলাকায়। সেকেনড অফিসার কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'আমরা রেডি। আপনি এগোতে পারেন।' তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যারেস্ট করতে হবে কি কাউকে?'

'না-না, তার কোনো দরকার নেই। আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

নির্বাচনের আগের দিন সমস্ত এলাকাটা কেমন যেন থমথমে। পার্থপ্রতিম ঘড়িতে দেখল রাত প্রায় সাড়ে আটটা। গাড়ি চলতে শুরু করল।

সামনে পুলিশের জীপ, পেছনে পার্থপ্রতিমের গাড়ি এগিয়ে চলল ধীরে-ধীরে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকার গলির একেবারে ভেতরে।

নিঝুম নিস্তব্ধ পাড়ায় আবার গাড়ির আওয়াজ হতেই দরজা এবং জানলাগুলো পটাপট বন্ধ হল। বেশ কিছুটা এগিয়েই সামনে একটা ফাঁকা মাঠ। কিছু ছায়া-ছায়া জটলা।

সেকেনড অফিসার জীপ থামালেন। মাঠের আবছায়ার জটলায় দুপদাপ দৌড়োনোর শব্দ।

সেকেনড অফিসার চিৎকার করলেন, 'হ্যানডস আপ। পালালে গুলি করব।' ছায়াগুলো দাঁড়িয়ে গেল।

পার্থপ্রতিম সেকেনড অফিসারকে বলল, 'আপনি গুলি করব বলতে গেলেন কেন?'

সেকেনড অফিসার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না বললে ওরা সবাই চলে যেত।'

আস্তে-আস্তে ওরা এগিয়ে চলল মাঠের দিকে। অফিসার চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। আপনাদের কাউকেই আমরা অ্যারেস্ট করতে আসি নি।'

সামনে এগিয়ে গিয়ে অফিসার বললেন, 'ইনি পার্থপ্রতিম মিত্র। উনি এসেছেন আপনাদের অভিযোগ শুনবেন বলে। আপনারা এনাকে নিশ্চই সবাই চেনেন।' ততক্ষণে ঘর থেকে দু-চারজন বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়।

পার্থপ্রতিম সবাইকে একবার দেখে নিয়ে হাত জোড় করে বলল, 'আমাদের পার্টির নির্দেশ—কোনো নিরীহ লোকের প্রতি যেন কোনোরকম অত্যাচার না হয়। অত্যাচারিত এবং দরিদ্র সমাজের পাশে আমরা চিরকাল থেকেছি এবং থাকব। সমাজবিরোধীদের এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। আপনারা আপনাদের অভিযোগ নির্দ্বিধায় আমাদের জানান। সঙ্গে পুলিশ অফিসার আছেন। তাঁকে অনুরোধ করে আমরা ডেকে এনেছি। প্রয়োজনে আইনের ব্যবস্থা উনি নেবেন।'

পার্থপ্রতিমের চারপাশে এমন অনেক ভিড়। সবাই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইছে। ভাঙাচোরা মানুষগুলোর চোখে-মুখে কেমন যেন অবিশ্বাসীর ভাব। একটা বাচ্চা ছেলে ককিয়ে উঠল তার মায়ের কোলে। জটলায় একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। পার্থপ্রতিম ঘুরে একবার চারপাশ তাকাতেই সবাই নিশ্চুপ। সেকেনড অফিসার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কী হল? আপনারা কিছু বলুন।'

'এ বুড়িয়া, তু বোল তেরা বাত।' কজন ঠেলে এগিয়ে দিল এক বুড়িকে। বুড়ি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পার্থপ্রতিম আধো অন্ধকারে ঘুরে তাকাল ভিড়ের-মধ্যে-মিশে-যাওয়া বুড়ির দিকে। চোখে মুখে বেশ উত্তেজনা।

'নাগেশ্বর কো অ্যাইসান পিটা বাবু পুরা হাড্ডি তোড় দিয়া।' ভিড়ের মধ্যে একজন বলল।

'কে নাগেশ্বর?' তাকাল পার্থপ্রতিম।

'হামার লেড়কা বাবু। অভি হসপতল ভেজল।' ভিড়ের মধ্যে থেকে বুড়ি এগিয়ে এল।

'তোমার লেড়কা কী করে?'

'ভুজিয়াকা দুকান আছে টিনবাজারে।'

অত্যন্ত নরম গলার পার্থপ্রতিম বলে, 'আমি হাসপাতালে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি। তোমাদের কোনো চিন্তা নেই।'

'চিন্তা নেই? লেকিন এ আসলি বাত আছে তো বাবু?' একটা ভরাট গলা কথাগুলো বলে উঠল।

থতমত খেয়ে পার্থপ্রতিম বলল, 'কে বললে? সামনে এগিয়ে এসে বলো।'

'নমস্তে বাবু। হমলোগ তো সবাই জানে ক্যায়সে কেয়া কুছ হোলো।' লোকটা ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল সামনে একেবারে পার্থপ্রতিমের মুখোমুখি।

'তোমার নাম কী?' চিন্তিত পার্থপ্রতিম প্রশ্ন করে।

'হমাকে পহেচানতে পারলেন না?'

কাঁচাপাকা একমাথা চুল। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। লম্বা, বলিষ্ঠ। মনে করার চেষ্টা করে পার্থপ্রতিম—খুব চেনা মুখ, অথচ···।

'ইশাউদ্দিন খান। কিযেনচাঁদ জুট মিলে কাম করতাম। ট্রেড ইউনিয়ন ভি। আপ থে প্রেসিডেনট।

বিচ্ছিন্ন সমুদ্রে দ্বীপের সন্ধান পেল পার্থপ্রতিম। বেশ জোরে বলল সে, 'ইশাউদ্দিন তুমি? ভালোই হল, আরও এগিয়ে এসো। তোমার মুখ থেকেই শুনব। বলো।'

'কেয়া বোলেগা বাবু? ফালতু হাঙ্গামা হোয়ে গেলো। নাগেশ্বর, বালকিষেন, রতন, দিলীপ আউর ছোটকু জখম হোলো। সব ভোলে ভালা। কাম ধান্ধা কোরে। অভি হাসপাতাল।'

'কী কাম ধান্ধা করে ইশাউদ্দিন ওরা?'

'কিযেনচাঁদ বন্ধ হোয়ে গেলো তিন মাহিনা। আপলোগ বোলা ইলেকশান কি পহলে সব মিটমাট হো যায়গা। অভি ছুসরা ধান্ধামে কাম কোরে। ভুজিয়া বিক্রি কোরে। রিকশা চালায়। অভি জখম হোয়ে গেলো।'

'ঠিক আছে, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

'বাবু, কিযেনচাঁদ কি বারে মে আপলোগ কেয়া খবর লিয়া?'

পার্থপ্রতিম ভেতরে-ভেতরে জ্বলে ওঠে। বাইরে যথাসম্ভব সংযত হয়ে বেশ চাপা অথচ গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, 'তুমি এখন আর আমাদের পার্টি ইউনিয়নে নেই, তাই না, ইশাউদ্দিন?'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় ইশাউদ্দিন বলে, 'ইসপিরিং ডিপার্টে ঝামেলা হোলো। আপ থে উনটাইম। আপকো তো সবহি মালুম হ্যায়। আমি ডিপার্টের চাকা বন্ধ কোরলাম। সাসপেনড করল মেনেজমেনট। লেকিন আপ সমঝোতা কর লিয়ে থে মেনেজমেনটসে। হমার তকলিফ হোলো, বহত তকলিফ।'

'ইশাউদ্দিন, সেদিন তুমি পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে আন্দোলন করেছিলে।'

'সো তো ঠিক বাত। লেকিন পহিলে হমাকে মদত দিয়েছিলেন আপ। আপ বোলে থে, তুম চলো, হম তুমহারা পিছে হ্যায়।'

'এখন থাক ইশাউদ্দিন ওসব কথা।' পার্থপ্রতিম ঘুরে চারপাশ দেখে নেয়। মানুষের ভিড়ে এখন থইথই করছে চারপাশ। মনে-মনে হঠাৎ একটা ভয় দানা বেঁধে উঠতে থাকে। অভিজ্ঞ পার্থপ্রতিম নিজেকে সামলে, গলার স্বর যথাসম্ভব জোরে তুলে বলতে থাকে, 'ইশাউদ্দিন, পার্টি তোমাদের অনেক দিয়েছে। কাল ভোট। পার্টির কথা ভেবে তোমরা কাজ করো। পার্টি তোমাদের দেখবেই ভবিষ্যতে।' কথাগুলো বলে সে হাঁটতে লাগল জোরে গাড়ির দিকে। পেছনে সেকেনড অফিসার, কনস্টেবল ও পার্থপ্রতিমের সঙ্গে আসা আরও কজন যুবক।

জোরে শব্দ করে গাড়িগুলো বেরিয়ে গেল। এ-গলি ও-গলি এঁকে-বেঁকে জীপটা বড়ো রাস্তায় এসে পড়ল। পার্থপ্রতিম গাড়ি থামিয়ে সেকেনড অফিসারকে অনুরোধ করল একবার হাসপাতালে যাবার জন্য। সেকেনড অফিসার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই পার্থপ্রতিম বলল, 'আপনি আমার জন্য অনেক কিছু করলেন। আই শ্যাল বী গ্রেটফুল টু ইউ। কাল সকালেই একবার সৃজনকে পাঠিয়ে দেব হাসপাতালে।'

সেকেনড অফিসার চলে গেলেন। পার্থপ্রতিম ড্রাইভারকে বলল সৃজনের বাড়ির দিকে যেতে।

রাস্তার দুধারে পার্টির ছেলেরা পোস্টার লাগাচ্ছে, ব্যানার টাঙাচ্ছে। সর্বত্রই একটা সাজো-সাজো রব। পার্টির ছেলেরা এখন খুব অ্যাকটিভ। এখনও পার্টির শৃঙ্খলার দিকটা নিজের হাতে রাশ টেনে ধরে রাখতে পেরেছে এই ভেবে মনে-মনে প্রশান্তি লাভ করে পার্থপ্রতিম। তার এলাকায় সৃজনকে জেতাতেই হবে। যে-কোনো মূল্যে। এইবার এই এলাকা থেকে বিধানসভায় যাবে সৃজন চক্রবর্তী। পার্টির উঁচু মহলের কাছে এটা তার চ্যালেনজ। যদি জেতে তবে পার্টির উচ্চ মহলে পার্থপ্রতিমের প্রভাব আরও বাড়বে।

তিন

গোপালনগর রোডের নতুন-গজিয়ে-ওঠা পাড়াটা বেশ পরিচ্ছন্ন। অনেক নতুন ছিমছাম বাড়ি। সৃজন এ পাড়ারই বাসিন্দা। তার বাড়ির অনতিদূরে একটা

স্কুলে কালকের জন্য এ চত্বরের ভোটকেন্দ্র। সৃজনের বাড়ির পাশেই একচিলতে জমির ওপর তৈরি হয়েছে সৃজনদের অস্থায়ী পার্টি অফিস। অনেক সদস্যের ভিড়। গ্রামোফোন বক্সে দেশাত্মবোধক গান চলছে। কয়েকজন গলা মিলিয়ে সুর তুলছে। আবহাওয়াটা আজ অনেক ঠাণ্ডা।

গাড়িটা থামল অস্থায়ী পার্টি অফিসের সামনে। পার্থপ্রতিম নেমে খানিকক্ষণ দাঁড়াল। খুব ইচ্ছে করছিল ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটা গাইবার। নিজেকে সামলে নিল। কয়েকজন এগিয়ে এল, 'আসুন, পার্থদা।'

'না ভাই, এখন বসব না। একটু সৃজনের কাছে যাব। তোমরা গানটা গাও। বড়ো ভালো গান। মনে-মনে কাজের প্রেরণা পাবে। হৃদয়ে অনুভব করো, এগিয়ে যাবার জন্য মনে জোর পাবে।'

ছেলেগুলো মাথা নীচু করে শুনছিল। পার্থপ্রতিম খানিক থেমে আবার বলল, 'আদর্শের সঙ্গে নিজের চাওয়া-পাওয়াকে মিশিয়ে ফেলো না। একদিন দেখবে অযাচিতভাবেই সব এসে যাবে।'

ছেলেগুলো এইবার একসাথে বলল, 'পার্থদা, কাল আমরা কোমর বেঁধে নামব। পার্টি জিতবেই—দেখে নেবেন।'

পার্থপ্রতিম পা বাড়াল সৃজনের বাড়ির দরজার দিকে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

বসবার ঘরে সৃজন ছিল না। সোফায় গা এলিয়ে দিল পার্থপ্রতিম। সামনে দেওয়ালে টাঙানো এক বিখ্যাত দার্শনিকের বিশাল অয়েলপেনটিং। বইয়ের আলমারিতে থরে-থরে সাজানো বই। সৃজন কলেজ জীবনে ওর সহপাঠী ছিল। মেধাবী ছাত্র। প্রথম পার্টির দর্শন, দলের আদর্শ সৃজনই পড়িয়েছিল, জানিয়েছিল পার্থপ্রতিমকে। সৃজন ভালো বক্তৃতা দিতে পারত। একসঙ্গে দুজনে বিভিন্ন জায়গায় দলের কাজ করেছে বহুদিন। দলের ভাবমূর্তি, দলের আদর্শকে বজায় রাখতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল কতদিন।

'কখন এলি?' সৃজন ঘরে এল।

'এই মাত্তর। বড্ড ক্লান্ত রে। সারাদিন যা ঝড় গেল।'

'কোনো খবর দিবি? আমার শরীরটা বিকেল থেকে পারমিট করছে না একদম। এ বেলাটা রেস্ট নিলাম।'

'ভালোই করেছিস। কাল তো তোর সারাদিন টেনশান।' পার্থপ্রতিম একটা সিগারেট ধরাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আজ অনেকদিন বাদে একজনকে দেখলাম।'

সৃজন উত্তরের অপেক্ষায়, 'কাকে দেখলি?'

'ইশাউদ্দিন, ইশাউদ্দিন খান। কিষেনচাঁদ জুট-মিলে একসাথে ট্রেড ইউনিয়ন করেছি।'

'তাতে কী হল? নতুন কিছু···?'

'না, বরং দেখলাম সেই একই রকম। লড়াকু, জেদি, প্রতিবাদী।'

'এখনও কি আমাদের দলে আছে, নাকি এনিথিং রঙ?'

পার্থপ্রতিম সৃজনকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভিস্তিমিঞা বস্তির অ্যাকশানটা মোটা-মুটি সাকসেসফুল। তবে থানার অফিসার-ইনচার্জ একটু বেঁকে দাঁড়াল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

সৃজন হেসে বলল, 'লোকটা একটু আদর্শবাদী।'

পার্থপ্রতিম জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায় সৃজনের দিকে, 'কেন, আদর্শবাদী আমরা নই?'

সৃজন থতমত খেয়ে বলে, 'অবশ্যই আমরা আদর্শবাদী।'

দুজনেই চুপচাপ। মণিমালা শরবত নিয়ে এল। বলল, 'এটা খেয়ে নাও। অনেক রাত হয়েছে, টেবিলে খাবার রেডি।'

শরবতে চুমুক দিতে-দিতে পার্থপ্রতিম বলল, 'আজকের অ্যাকশানটা মনে হয় আমাদের ভুল স্ট্র্যাটিজি। সন্ত্রাস করে তেমন বোধ হয় ফায়দা

উঠবে না।'

সৃজন বলল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম এ ব্যাপারে। বলেছিলাম ইলেকশানের দিন সময়মত বুথ দখল করলেই চলবে। তোরাই তো সবাই মিলে মিটিঙে·····।'

'সৃজন, তুই জিতবি এটা বড়ো কথা নয় আমার কাছে। বড়ো কথা হল পার্টি জিতবে। আর তার জন্যেই আমরা শিয়োর হতে চাইছি। চল, খেয়ে নিই। অনেক রাত হল।' কথাগুলো বলে পার্থপ্রতিম উঠতে-উঠতে বলল, 'আজ রাত্রে তোর বাড়িতেই থাকব।'

সৃজন বলল, 'ভালোই হল। রাতটা গল্পে-গল্পে কেটে যাবে।'

মণিমালা টেবিলে খাবার সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পার্থপ্রতিম টেবিলে বসতে-বসতে হাসল মণিমালার দিকে তাকিয়ে।

'আর হেসো না। অনেক দেরি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করো।' গম্ভীর মণিমালা জবাব দেয়।

'আমরা দুঃখিত, ম্যাডাম।' হেসে জবাব দেয় পার্থপ্রতিম।

একটু দূরে মণিমালা রাতের গোছগাছে ব্যস্ত হল। কালকের ভোটের জন্য কি এই মুহূর্তে মণিমালার মনে কোনো টেনশান আছে? পার্থপ্রতিম ভাবে—সেই মণিমালা! ছটফটে, উচ্ছল, সরল মণিমালা। আস্তে-আস্তে বছর গড়াতে-গড়াতে এখন কেমন যেন স্থূলকায়া, ধীর, গম্ভীর। ওদের ছেলেটা প্রায় বছর দশেকের হল। পার্থপ্রতিম বোঝে—মণিমালার সাধ থাকে তো সৃজনের সময় থাকে না। অধ্যাপক সৃজনের রাজনীতি সামলে ইচ্ছে থাকে তো উপায় থাকে না তেমন করে। বুকের মধ্যে এক থামচা অভাব আর অভিমান নিয়ে হয়তো মণিমালা প্রহর গোনে।

রাত অনেক গভীর। দুটো সোফায় দুদিকে গা এলিয়ে মুখোমুখি দুজন। ঘরেতে না-বলা অনেক কথা, নিস্তব্ধ বাতাস, ফেলে-আসা অনেক স্মৃতি দেওয়ালে, আলমারিতে, অ্যালবামে। সৃজন অ্যালবাম ওলটাচ্ছিল। ও নিজে একজন ভালো ফটোগ্রাফার। ওলটাতে, ওলটাতে—ইউনিভার্সিটি লন, কোলকাতার মিছিল, দেরাদুন, পুরী, মুসৌরি, দিল্লী, পার্টির রাজ্য সম্মেলন, কিষেনচাঁদ জুটমিল, গোপালনগর রোডের আশপাশ, স্থানীয় নারীপ্রগতি সমিতির বাৎসরিক উৎসবে উদ্বোধনে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে পার্থপ্রতিম, পেছনে··· । সৃজনের চোখ থেমে যায়। লালপেড়ে দুধসাদা শাড়ি, কালো চুল বিনুনি বেঁধে ঝোলানো, ঢলো ভরাট মুখ। কালার্ডে ইমপ্রেশানটা দারুণ হয়েছে সুনন্দার। সৃজন চুপচাপ কী যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'পার্থ, এবার বিয়ে কর সুনন্দাকে।'

পার্থপ্রতিম চমক ভেঙে তাকাল সৃজনের দিকে। সুনন্দা। জানলার বাইরের বাগান থেকে মরশুমি ফুলের পাঁচমিশেলি মিঠে সুবাস হঠাৎ গাঢ় হয়ে এল তার কাছে। প্রাণ ভরে গন্ধ নিল। সারাটা শরীরে এক আশ্চর্য ভালো-লাগার শিহরন।

'কী হল? কথা বলছিস না যে?'

'দেখি, আগে এসব মিটুক'—ধরা গলায় বলল পার্থপ্রতিম।

'সুনন্দার কথাটা একবার ভাব।'

'ভাবি সৃজন।'

'কী ভাবিস?'

'আমি বোধ হয় ধীরে-ধীরে হেরে যাচ্ছি ওর কাছে।' গভীর শ্বাস ফেলে বলল পার্থপ্রতিম।

'পুরুষরা হারতেই ভালোবাসে।'

'আসলে ও অনেক বড়ো মাপের।' বিমর্ষ হেসে বলল পার্থপ্রতিম।

'ওটা তোর বিনয় অথবা ওর প্রতি তোর গভীর বিশ্বাস, ভালোবাসা।'

'না সৃজন, এটা সত্যি। আমার কেবলই জেতার নেশা আর সুনন্দার সঠিক কাজের নেশা নিজের পরাজয়ের মূল্যেও।' কথাগুলো বলতে গিয়ে গলায়

একঝলক আবেগ ঝরল পার্থপ্রতিমের।

বাইরে তখন শেষ রাতের রাগিণীর সুর। একটা অনুচ্চ সঙ্গীত বাজছে পার্থপ্রতিমের কানে। বাইরের আলো-আঁধার হয়ে নেশা-ধরা সুর বাজছে এ ঘরের অলিন্দে-অলিন্দে। সেই সুর ঘিরে ফেলছে একটু-একটু করে পার্থপ্রতিমের সমস্ত শরীর মন। পার্থপ্রতিম এখন আনন্দ আর বিষাদের মাঝখানে কেমন যেন স্থবির, জটিলতাবিহীন একটা স্বচ্ছ মানুষ। হঠাৎ ঠিকরে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় মনের গভীর গোপন কোণে লুকোনো যাবতীয় শোক।

'হঠাৎ হেরে যাওয়ার কথা বলছিস কেন?' সৃজন প্রশ্ন করে আবার।

ম্লান হেসে পার্থপ্রতিম বলে, 'দেখছিস না, চোখ-ধাঁধানো আলোর নেশায় আমরা কেমন পতঙ্গের মতো দৌড়চ্ছি।'

'আলোর নেশাতেই তো বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম, পার্থ।'

'কিন্তু পথটা যদি সঠিক না হয়?'

সৃজন কোনো উত্তর দেয় না। গভীর গম্ভীর রাতে নিস্তব্ধ পাড়া। বাড়ির পাশে অস্থায়ী পার্টি অফিসে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এখন স্তব্ধ। পাশের ঘরে মণিমালা তার দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। মণিমালা কি এখন সত্যিই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সৃজন ভাবে। সে নিজেও বোঝে—দলের আদর্শের রঙ এখন অনেক ফিকে।

বালিশটা মাথার কাছে টেনে নিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ে পার্থপ্রতিম। তারপর একবুক নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'এখন আমরা হাঁটছি একটা বিরাট রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে। বেশ বুঝতে পারি, সৃজন, সঠিক পথ থেকে সরতে-সরতে একদিন যদি আলো সরে যায় তখন গোলকধাঁধায় ঘুরতে-ঘুরতে· ···।'

মাঝপথে কথা থামিয়ে দিয়ে সৃজন বলে, 'তোর কী হল বলতো আজ?'

'জানি না, হয়তো দুঃখবিলাস।'

'তোর মতো দৃঢ়চেতা একজন বুদ্ধিমান নেতার মুখে একথা মানায় না।'

পার্থপ্রতিম হঠাৎ সোফয় উঠে বসে পড়ে। তারপর উত্তেজিত হয়ে বলে, 'তুই হলপ করে বলতে পারিস, তুই দেশপ্রেম অনুভব করিস তেমন করে।'

'কী আজেবাজে বকছিস। অনেক রাত হল। রেস্ট নে।'

নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে-ধীরে পার্থপ্রতিম বলে, 'রাতের নেশাধরা নির্জনতায় নিজেকে নগ্ন করে দেখা ভালো, সৃজন। ওতে মনের ক্লেদ, দ্বন্দ্ব অনেক প্রশমিত হয়।'

'সত্যি করে বল তো—ইশাউদ্দিন কি আজ তোকে হন্ট্ করছে?' সৃজন বলল।

কথার জবাব না দিয়ে পার্থপ্রতিম চুপ করে যায়। তারপর আবার আস্তে-আস্তে সোফায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে।

সৃজন চুপচাপ। ঘরের ভেতর নীরবতা। সৃজনের মনে পড়ে যায় আজ থেকে দু-দশক আগের সেই দিনের কথা, যেদিন সে এইখানে এসেছিল পার্টির নির্দেশে। সঙ্গে ছিল পার্থপ্রতিম সেদিন। নির্দেশ ছিল সংগঠন মজবুত করতে হবে শ্রমিক বেলটে। পার্থ চলে গিয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন জোনে। সৃজনের স্থান হয়েছিল আঞ্চলিক কমিটিতে। কিন্তু কাজের মাঝে দুজনেই দুজনের সঙ্গে থাকত ছায়ার মতো।

সৃজন এখন আচ্ছন্নতার ঘোরে। হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'তোর মনে পড়ে পার্থ, কিষেনচাঁদের গেটের সামনে সেই হোটেলটার কথা? এখন আর সেটা নেই। সারাদিন সংগঠনের কাজ করার পর সেই হোটেলে মাছ-ভাত বা রুটি-তরকা খাওয়ার কথা? হোটেলটার নাম ছিল মহামায়া রেস্টুরেনট।'

পার্থপ্রতিম নড়েচড়ে ওঠে, 'সবথেকে শিহরন জাগাত কোন্ জিনিসটা জানিস? যখন খাওয়ার সময় দেখতাম, কত যত্ন করে পাশে বসে খাওয়াত

জালালুদ্দিন, নারায়ণ তেওয়ারী, নীলু পাল, দিলীপ বরুয়াদের দল। আর খাওয়ার শেষে পকেটে হাত ঢোকাতে দেখলেই আঁতকে উঠত ওরা। তারপর সবাই মিলে ভাগাভাগি করে পরম তৃপ্তিতে·····। এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে।'

ভোর হয়ে এল। আকাশের তারাগুলো কেমন আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা ধোঁয়াশা আলোর আস্তরণ। সৃজন ঘুমিয়ে পড়েছে। পার্থপ্রতিম বুঝতে পারে সুনন্দার কাছ, সুনন্দার জেদ, সুনন্দার ত্যাগ ওর মনের মধ্যে একটা নিদারুণ দ্বন্দ্বের আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে আস্তে-আস্তে। সুনন্দা দলের সংস্কার-পন্থীদের ঢেউয়ে গা ভাসাচ্ছে। পার্থপ্রতিম বোঝে সেই প্রথম জীবনে যে স্বপ্ন ছিল আকাঙ্ক্ষিত এখন তা ধোঁয়াশা মলিন। শুধুই জেতবার নেশা যে-কোনো মূল্যে। আজকাল একেবারে মনের গভীর গোপন কোণে একটা দ্বন্দ্বের গন্ধ পায় সে। দ্বন্দ্ব একদিকে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার, অন্যদিকে আদর্শের টানা-পোড়েনের। আজ নির্বাচনের দিন। পার্থপ্রতিম হাঁটবে দ্রুত লয়ে, চলবে দ্রুত পায়ে। তার অঙ্গুলি-হেলনে প্রয়োজনীয় বুথগুলো দখল করবে দলের ছেলেরা। ফলস ভোট পড়বে নির্বাচনকেন্দ্রের পর নির্বাচনকেন্দ্রে। সন্ত্রাস হয়তো ছড়িয়ে পড়বে প্রয়োজন মত জায়গায়-জায়গায়। কারণ জিততে তাদের হবেই। দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্বে, দ্বন্দ্বে দীর্ণ পার্থপ্রতিমের এই মুহূর্তে নিজেকে বড়ো অসহায়, নিঃস্ব, রিক্ত, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। সুনন্দার কাছে যাবে একবার। পার্থপ্রতিম ধীরে-ধীরে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বাইরে তখন প্রথম সকালের উজ্জ্বল নরম আলো।

বাইরে বেরিয়ে আর গাড়ি নেয় নি পার্থপ্রতিম। একটা সাইকেল রিকশায় আসতে-আসতে দূর থেকে দেখতে পেল সেই পরিচিত শরীরটা। মাঝারি উচ্চতা, একটু স্থূলকায়, গায়ের রঙ ফর্সা। খুব কাছে আসতেই সুন্দর টানা-টানা চোখে সেই প্রশান্তি অথচ আত্ম-তৃপ্তি পার্থপ্রতিমের চোখে যেন আজ খুব বেশি করে ধরা পড়ল।

'উঠে এসো, সুনন্দা।' ডাকল পার্থপ্রতিম।

সুনন্দার মুখে হাসির ঝিলিক। পাশে বসে প্রশ্ন করল, 'এত সকালে কি আমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ তোমার কাছে। কাল রাত্রে সৃজনের বাড়িতে ছিলাম।'

'জানি, খবর পেয়েছি।'

সুনন্দার মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। মাথার চুলের বিনুনি দুটো ঝুলছিল।

'কাল বড্ড তোমার কথা মনে পড়ছিল বার বার।'

রিনরিন করে হেসে উঠেছিল সুনন্দা। পার্থপ্রতিম আরও খানিকটা গম্ভীর হল।

দুজনেই চুপচাপ। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে।

সুনন্দা বলল, 'আমি একটু হাসপাতালে যাব।'

চমকে জিজ্ঞেস করল পার্থপ্রতিম, 'কেন?'

'সে কী! তুমি জান না? কালকে তোমাদের অ্যাকশানে তো অনেকেই হাসপাতালে।'

'এ কী সুনন্দা, তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?'

'আমি তো এভাবেই কথা বলি, পার্থ।'

পার্থপ্রতিম খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'সুনন্দা, আমার কাছে খবর আছে তুমি পার্টিবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত আছ। সংস্কারপন্থীদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে পার্টির কাজকর্মের সমালোচনা করছ প্রকাশ্যে। এগুলো কি তুমি অস্বীকার করতে পার?'

ভ্রূ কুঁচকে সুনন্দা বলল, 'একেবারেই না।'

'পার্টির কার্যপদ্ধতি নিয়ে ভাববার জন্য তো অনেক অভিজ্ঞ বিচক্ষণ নেতা আছেন উচ্চমহলে। আর তাঁরা ভাবছেনও নিশ্চয়ই।'

'কোনোটাই তেমন করে হচ্ছে না।'

'সুনন্দা, সমাজগঠনের দায়িত্ব পেয়েছ, সেটাই ভালো করে করো।'

'ভালো করে করতে চাই বলেই ক্লেদ, মলিনতার

বিরুদ্ধে আমি সোচ্চার।'

'তোমার এই কথা যদি উঁচুমহলে জানাজানি হয়?'

'জানাজানির জন্যই তো প্রতিবাদ। আর, তা ছাড়া, ওসব আমি ভাবি না। আসলে আমি তো তোমার মতো কেরিয়ারিস্ট নই।' দৃঢ় ভঙ্গিমায় বলল সুনন্দা।

পার্থপ্রতিম আর কথা বাড়ায় না। রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, 'কাঁহা রোখেগা, বাবু।'

পার্থপ্রতিম বলল, 'হাসপাতাল।'

সুনন্দা সপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিও যাবে?'

ঘাড় নেড়ে বলল পার্থপ্রতিম, 'যাব।'

পার্থপ্রতিমের চোখ সুনন্দার দিকে স্থির। সুনন্দার চোখে এক তৃপ্তিদায়ক আনন্দ দেখতে পেল সে। ধীরে-ধীরে চোখ তুলে তাকাল সকালের পরিষ্কার আকাশের দিকে। মনে-মনে বলল, 'সুনন্দা, অহংকারে লাগলেও তোমার কাছে হেরে যাওয়ায় কেমন একটা অদ্ভুত সুখ আছে।'

চার

একটা যেন ঝড় বয়ে গেল ভোটকেন্দ্রটার ওপর দিয়ে। এখন চত্বরটা নিশুতি। বোমার টুকরোর ঘায়ে এই স্কুল বাড়িটার পুরোনো একটা দেওয়াল ধসে পড়েছে। রাস্তার ওপর একটা আবর্জনায় খানিক আগে আগুন ধরে গিয়েছিল, এখন ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বাইরে একটা সাদা অ্যামবাসাডর তখনও দাঁড়িয়ে। স্কুলবাড়ির ভেতরে ভোটকেন্দ্রের দরজাগুলো তখনও বন্ধ। দু-চারজন হোমগার্ড এবং পুলিশ কনস্টেবল যারা এখানে ছিল তাদের আর দেখা যাচ্ছে না।

পশ্চিম দিকের পাড়াটা ভিস্তিমিঞা বস্তি। গলির বাঁকের মুখেই হুড়হুড় করে লোকজন এসে পড়ল। ভিস্তিমিঞার জনতা উদ্বেল হয়ে ছুটে আসছে ভোটকেন্দ্রের দিকে। সবার সামনে সেই ঋজু আর বয়স্ক লোকটা—ইশাউদ্দিন।

ভোটকেন্দ্রের দরজাগুলো পটাপট খুলে গেল। বেশ কয়েকজন যুবক বেরিয়ে এল। ততক্ষণে গাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে জনতা। হঠাৎ একটা যুদ্ধ বেধে গেল। বেশ কয়েকটা বোমার শব্দ, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার। অতি তৎপর যুবকেরা সামনেটা ফাঁকা করে গাড়ি নিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল। জনতার মধ্যে হঠাৎ চিৎকার উঠল—ইশাউদ্দিন চাচা গির গিয়া, ইশাউদ্দিন চাচা পড়ে গেছে। একটা রক্তাক্ত লাশ তখনও ধুঁকছে। জনতা ঝুঁকে পড়ল তার দিকে। ইশাউদ্দিন হাতটা তুলে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল। আরও দু-তিন জন তখনও রক্তাক্ত অবস্থায় ছুটছে।

হঠাৎ পুলিশের জীপ ঢুকল ভোটকেন্দ্রের ভেতর। সবাই পড়িমড়ি করে যে যার গা ঢাকা দেওয়ায় ব্যস্ত। সেকেনড অফিসার নেমেই চিৎকার করলেন, 'এক পা নড়লেই গুলি করব।' কয়েকজন কনস্টেবল তড়িঘড়ি জীপ থেকে নামল। সামনে গিয়ে ইশাউদ্দিনের দেহটাকে দেখেই চিৎকার করে বলল, 'স্যর, একটা বডি।' সেকেনড অফিসার দেখে নেড়ে-চেড়ে বললেন, 'কালকের সেই লোকটা না?'

কালকের সেই লোকটাকে কনস্টেবলরা ধরাধরি করে জীপে তুলল। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে পুলিশ ধরে জীপে তুলেছে। সেকেনড অফিসার চেঁচিয়ে বললেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে ভোট না দিলে আমি সবাইকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।'

ভিড়ের মধ্যে দুজন বলে উঠল, 'লেকিন সাহেব, লোগ বোলতা হ্যায় সবকো ভোট দেনা হো গিয়া।' সেকেনড অফিসার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর জোর কদমে হাঁটা দিলেন জীপের দিকে।

পেছন থেকে নারীকণ্ঠে কেউ একজন হঠাৎ বলে উঠল, 'দাঁড়ান অফিসার, আমার কিছু কথা আছে।'

সেকেনড অফিসার চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছেন একজন মহিলা। মাঝারি উচ্চতা, স্থূলকায়া, গায়ের রঙ ফরসা। মুখে একটা প্রশান্ত ভাব।

'বলুন।' অফিসার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওদের ছেড়ে দিতে হবে।'

'কেন?' আশ্চর্য হলেন অফিসার।

'ওরা নির্দোষ, তাই।' নারীকণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়।

'সেটা কোর্টে প্রমাণিত হবে। কিন্তু আপনি কে? যদিও আপনাকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে আমার।'

'আমি সুনন্দা রায়। নারী প্রগতি সমিতির সভানেত্রী।'

অফিসারের এবার বিস্ময় ঝরে পড়ল। বললেন, 'আপনি এতক্ষণ এখানে ছিলেন?'

'কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছি। যতটুকু দেখেছি—ওরা নির্দোষ।'

'পার্থপ্রতিমবাবু জানেন যে আপনি এই গণ্ডগোলের মধ্যে এখানে এখন?'

'আমার কথা কিন্তু আপনি রাখছেন না, অফিসার। এরা নির্দোষ। এদের ছেড়ে দিন।'

'বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন এদের ছেড়েই দিলাম। আর এই জখম লোকটাকে তো হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হবে।'

কটা লোককে নামিয়ে দিয়ে অফিসার দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ইশাউদ্দিনের ক্ষতবিক্ষত দেহটা নিয়ে হাসপাতালের দিকে।

পার্থপ্রতিম বসে ছিল পার্টি অফিসে। সুজন ঘোরাঘুরি সেরে তখনও ফেরে নি। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। পার্থপ্রতিম রিসিভার তুলতেই সেকেনড অফিসারের গলা ভেসে এল, 'একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। নারী প্রগতির মিস সুনন্দা রায়কে দেখলাম গণ্ডগোলের মধ্যে ওখানে।'

প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠল পার্থপ্রতিম, 'হোয়াট?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। কিছু লোককে অ্যারেস্ট করেছিলাম। ওনার রিকোয়েস্টে ছেড়ে দিলাম। পরে শুনলাম আহতদের উনি নিজে মেডিকেল এসকর্ট করেছেন।'

ফোন নামিয়ে ধীরে-ধীরে গম্ভীর মুখে বসে পড়ল পার্থপ্রতিম। তারপর ভাবতে লাগল—ব্যাপারটা পার্টি কমিটিতে উঠলে সুনন্দার তরফে কী জবাব দেবে মিটিঙে বা পার্টির লোকজনের কাছে। কিন্তু সুনন্দাকে তো আড়াল করতেই হবে।

সুজন ঘরে ঢুকল, বলল, 'পার্থ, শুনেছিস সুনন্দা রিস্ক নিয়ে স্পটে গিয়েছিল। এমনকী আহতদের নিজে মেডিকেল এসকর্ট···।'

চকিতে পার্থপ্রতিম রহস্যঘন হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলল। তারপর বলল, 'প্ল্যানিংটা আমার, সুজন। কাজটার সমাধান করে সুনন্দাকে দিয়ে কেমন সুন্দর ম্যানেজ করলাম বল। আরে, আজকে সকালেই তো·····।'

মাঝপথে কথা থামিয়ে দিয়ে সুজন মৃদু ধমকের স্বরে বলল, 'পার্থ, আমার কাছেও লুকোচুরি খেলছিস তুই?'

পার্থপ্রতিম চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে পড়ে। সুজন পার্থপ্রতিমের কাছে এসে আস্তে-আস্তে ওর পিঠে হাত রাখে। তারপর বলে, 'সুনন্দাকে ওর মতোই থাকতে দে, পার্থ। ও ওর মতোই ভাবুক, ও ওর মতোই চলুক।'

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। কয়েকজন যুবক ঝড়ের গতিতে ঢুকল।—'পার্থদা, অ্যাকশন কমপ্লিট। চারটে উনডেড, একটা···।'

আরও একজন তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'নারী প্রগতির·····।'

পার্থপ্রতিম কথাটাকে লুফে নিয়ে বলল, 'ওটা আমার প্ল্যান, হ্যাঁ, মানে আমাদের প্ল্যান।'

সৃজন সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, মানে আমাদের স্ট্র্যাটেজি। ওটা একটা পলিটিক্যাল স্টানট ধরতে পার।'

আবার ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল সৃজন। ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সৃজন শুনছে। ঘরের ভেতর কঠিন নীরবতা। কথা শেষ হতেই ধীরে-ধীরে ফোনটা নামিয়ে রাখল সৃজন। তারপর পার্থপ্রতিমের দিকে মুখ তুলে বলল, 'ইশাউদ্দিন ডেড। পুলিশ রিপোর্ট—ভিস্তিমিঞার আগুন এখন গনগনে।'

পাচ

সন্ধের অন্ধকারে ক্লান্ত সুনন্দা বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। ভোটপর্ব শেষ। জানলা দিয়ে বাইরের আকাশটা দেখা যায়। ঘন নীল আকাশে অসংখ্য তারার জোনাকি। বোমার টুকরোর আঘাতে ইশাউদ্দিনের ক্ষতবিক্ষত মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। এরই নাম রাজনীতি। শুধুই ক্ষমতাদখল। ভাবতে অবাক লাগে—ওর সবথেকে কাছের মানুষ পার্থপ্রতিমের চোখেমুখে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়, আদর্শের জন্য কী দারুণ আত্মত্যাগ! ভেতরে-ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠে সুনন্দা। মনে-মনে বলে, 'পার্থ, আমাদের স্বপ্ন কেন সার্থক হল না বলতে পার?'

সন্ধে উতরে গেছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হতেই উঠে দাঁড়ায় সুনন্দা। দরজা খুলেই দেখে পার্থপ্রতিম।

'রিকশায় এলে?'

গম্ভীর পার্থপ্রতিম ঘাড় নাড়ে। তারপর বিছানায় এসে বসে।—'একগ্লাস জল দাও। ভীষণ টায়ার্ড।' তারপর খানিকক্ষণ থেমে বলে, 'তোমায় বাড়িতে পাব ভাবি নি।'

কুঁজো থেকে জল গড়াতে-গড়াতে সুনন্দা বলে, 'চলে এলাম আমার আর কোনো কাজ নেই এই ভেবে।' তারপর জলের গ্লাসটা পার্থপ্রতিমের হাতে দিয়ে বলে, 'তুমি এত কাজ ছেড়ে এখন এখানে?'

'ভালো লাগছে না। মনে হল তোমার কাছে আসাটা এখন খুব জরুরি।'

সুনন্দা গলায় শ্লেষ ঢেলে বলে, 'কৈফিয়ত নেওয়াটা কি খুবই জরুরি?'

পার্থপ্রতিম জোরে ঘাড় নেড়ে বলে, 'না-না সুনন্দা, তুমি যেজন্য ভাবছ সেজন্য এখন এখানে আমি আসি নি।'

সুনন্দার কৌতূহলী চোখ দুটো পার্থপ্রতিমের দিকে স্থির।

পার্থপ্রতিম আস্তে-আস্তে বলে, 'সুনন্দা, এ আমি বেশ ভালোভাবে জানি তুমি যা অনায়াসে পার তা আমি পারি না। তোমার ভাবনা, চিন্তা, কাজ সে অমূলক নয়, তা আমি অনুভব করি।'

'আজকের কাজে তুমি আমাকে আড়াল করেছ!' পার্থপ্রতিম তাকাল সুনন্দার দিকে।

'তুমি সবাইকে বলেছ, আমার ঐ ঘটনাস্থলে যাওয়াটা তোমাদের নতুন পোলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি।'

পার্থপ্রতিম ঘাড় নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ, বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। তা নাহলে হয়তো পার্টিতে অন্য রিঅ্যাকশান হত।'

'কিন্তু তুমি তো ভালোভাবেই জান আমি যা করেছি তা সম্পূর্ণ আমার বিবেকের সমর্থনে। তার দায়ভাগটা সম্পূর্ণই আমাকে বহন করতে দিলে না কেন?'

'তোমাকে আড়াল করার অধিকার আমি অর্জন করেছি।'

সুনন্দা চুপ করে যায়। পার্থপ্রতিম বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে আছে। চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা। বাড়িতে কাজের মেয়েটা আর সুনন্দার বৃদ্ধা মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। দু-জনেরই বুকের ভেতর এখন উথালপাথাল ঢেউ।

নীরবতা ভাঙলে পার্থপ্রতিম।—'কাল রাত্রে সৃজন বলছিল এবারে আমাদের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করলে হয়।'

সুনন্দা কান পেতে শুনল কথাটা। তারপর খানিকক্ষণ কী ভেবে বলল, 'হঠাৎ এতদিন পরে আমাদের কথা এমন করে ভাবছ? সৃজনদা নাড়া দিয়ে তোমায় জাগাল বলে, নাকি অন্য কিছু?' সুনন্দার গলায় অভিমানের সুর স্পষ্ট।

'তা নয়। ভেবেছি অনেক দিন। কিন্তু তুমিও তো তেমন করে জানাও নি কিছু।'

সুনন্দা চুপচাপ। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। পার্থপ্রতিম অধীর আগ্রহে উত্তরের অপেক্ষায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর সুনন্দা বলল, 'ইচ্ছে তো আমারও হয়। বেলা গড়িয়ে গেল অনেক। কিন্তু…'

চমকে তাকাল পার্থপ্রতিম।

'ভয় হয় মাঝে-মাঝে।' ভেঙে-ভেঙে বলল সুনন্দা।

'কিসের ভয়?' জিজ্ঞেস করল পার্থপ্রতিম।

'ভয় হয় তোমার দৌড়নোর ঘটা দেখে। যদি কোনো দিন সংঘাত বাধে তোমার আমার ভাবনায়?'

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হেসে বলে পার্থপ্রতিম, 'তা সামাল দেবার মতো মানসিক জোর এবং ব্যক্তিত্ব দুটোই তোমার আছে, সুনন্দা।'

বাড়ির বাইরে গাড়ির শব্দ হল। দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ। প্রথম রাতের আলো-অন্ধকারে বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়াল সুনন্দা।

দরজা খুলে দিতেই চোখের সামনে সৃজন। সৃজন দ্রুত জিজ্ঞেস করে—'পার্থ আছে?'

সুনন্দা ঘাড় নাড়ে। সৃজন ঘরে এসে বলে, 'খবর পেলাম ভিস্তিমিঞার লোকজন এখানে আসছে। ওরা হাসপাতাল থেকে ইশাউদ্দিনের লাশ পেয়েছে। খবর পেয়েছে ওরা, তুই এখানে আছিস।'

সৃজন আবার বলল, 'আমি পুলিশে খবর দিয়েছি। দলের ছেলেদেরও।'

বাড়ির থেকে অনেক দূরে একটা হইচইয়ের শব্দ ভেসে আসছে। ঘরের ভেতর তিনটে সজাগ কান এখন উদ্গ্রীব। শব্দটা বাড়ছে। আরও অনেক কাছে। ঘরের ভেতর তিনটে মানুষের দ্রুত নিশ্বাস। তিনটে মুখ গভীর ভাবনায় অবিচল। শব্দটা এখন খুব কাছে।

বাড়িতে হুড়মুড় ঢুকে পড়ল কয়েকজন যুবক। 'সৃজনদা, পার্থদা, আমরা অ্যাকশান শুরু করছি। ওরা আসছে। সামনে ইশাউদ্দিনের লাশ। ওরা জবাব চাইছে।'

সৃজন তাকাল পার্থপ্রতিমের দিকে। সুনন্দা তাকাল পার্থপ্রতিমের দিকে।

পার্থপ্রতিম স্থির ভাবগম্ভীর এখন। বাইরে কোলাহল এখন তুঙ্গে। পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। সেকেনড অফিসার ধমক দিয়ে ভিড় হালকা করতে ব্যস্ত। ওরা স্লোগান 'দিচ্ছে। ওরা জবাব চাইছে।

সৃজন ব্যস্ত হয়ে ধমক দিল পার্থপ্রতিমকে, 'তাড়াতাড়ি আমরা একটা কিছু ভেবে ঠিক করি।' পার্থপ্রতিম গভীর চোখে তাকাল সুনন্দার দিকে। সুনন্দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল সৃজনের দিকে, তারপর বলল, 'ইশাউদ্দিনের লাশ আমাদের ফেলে-আসা প্রতিশ্রুতির লাশ, সৃজনদা। ওদের সঠিক জবাব আমাদের দিতেই হবে।'

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল পার্থপ্রতিম। সৃজনের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলল, 'সময় ঠিক সময়মতো জবাব চেয়ে নেয় জীবনের কাছে, সৃজন। চল, আমরা ওদের মুখোমুখি হই এখন।' তারপর সুনন্দার দিকে চেয়ে বলল, 'সুনন্দা, তুমি এগোও সবার আগে। আমরা তোমাকে অনুসরণ করছি।'

দলের ছেলেরা পেছনে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে। পেছনে পুলিশ নিরাপত্তারক্ষায় প্রস্তুত। ওরা তিনজন বাড়ির সদর দরজা পেরিয়ে উদ্বেল জনতার মুখোমুখি হতে চলেছে সঠিক জবাব দেবার আশায়।

কাব্যলোক

শুভ্রাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

'মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী'—"শেষ সপ্তক"-এর এক কবিতায় বলছেন রবীন্দ্রনাথ। আর বহুদিন পূর্বে "সোনার তরী"-তে শুনেছিলাম আবেগঘন কণ্ঠে মানস-সুন্দরীকে আবাহনের শেষে একটি শব্দবন্ধ—'কবিতা, কল্পনা-লতা'। কবির দীর্ঘ জীবনের দুই প্রান্তে দুটি বচনের অন্তরে প্রচ্ছন্ন কাব্যলোকের চিরন্তন সত্যটি : "পূরবী"-র 'স্বপ্ন' কবিতার ভাষায়—তোমারে ঘিরে আছে 'ছলন-ছায়ার কুহেলিকা'। সে ছলন-ছায়া যে কত নিবিড়, তার আভাসও মেলে "শেষ সপ্তক"-এর কবিতাটিতে : দীর্ঘ তিনটি স্তবকে শুনি মানুষের বোবার বাণী রচনার কাহিনী। সে কাহিনীটি এই :

মানুষের জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে
আপন সার্থক ভাষা।
মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা
যেমন বোবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
সেই বিরাট বোবা
আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে,
ব্যাখ্যা করে না।
বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গি, আছে ছন্দ,
আছে নৃত্য আকাশে-আকাশে।
অণুপরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন নাচের চক্র,
রচেছে সেই সীমায়-সীমায়,
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা,
ঘাসের ফুল থেকে শুরু করে
আকাশের তারা পর্যন্ত।
মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে,—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
* * * *
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

মনে পড়ে না দেশে-বিদেশে কোথাও শুনেছি

কাব্যকে ঘিরে এমন প্রকাণ্ড করে বলা এমন অদ্ভুত কথা, কোথাও দেখেছি মানুষের অবুঝ বোবা বোধকে কাব্যের উৎসমূলে রেখে, তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়ার অন্তরে বিরাট বোবার সঙ্গে তুলনা করে তার অভাবনীয় ক্রিয়াকাণ্ডের এমন স্তরিত প্রকাশ। রূপকের সজ্জা খুলে ফেলে দেখা যাক ভাবনার রূপটা : কবির গহন অন্তরে বোধে জাগে ঘনবাষ্পের মতো ভাবনাকল্পনা, অনুভূতি-উপলব্ধি ; তারা বোবা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো বিরাট বোবা। নিখিলবিশ্বে সৃষ্টির যে চিররহস্য, বোবার বাণীরচনায় কাব্যলোকেও জাগে সেই রহস্য। বোবা বিশ্বের মতো কাব্যও আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, ছন্দে নৃত্যে।

দ্বিতীয় স্তবকে শুরু হল বিরাট বোবার রূপসৃষ্টি : অসীম দেশে কালে আবর্তমান বিরাট বোবা অণু-পরমাণুর দল। কাব্যলোকেও নিরন্তর সক্রিয় তার জগতের বিরাট বোবা অণুপরমাণুরা : অবুঝ বোধে জেগে-ওঠা অনুভূতি-উপলব্ধি। তাদের অন্তরে জ্বলে ওঠে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ, ছড়িয়ে পড়ে তাদের আগুনের পাখামেলা ফুলকিগুলো, আর তখন শুরু হয় অপ্রকাশের অন্ধ মরু পার হয়ে বোবার বাণী-সন্ধান, রূপহীনের রূপসন্ধান। তখন সে বিরাট বোবা বাহন করে কথাকে, ভাষাকে ; ভেঙে দেয় তাদের লৌকিক অর্থের বেড়াঘেরা জগৎটা, পৌঁছয় ভিন্ন এক জগতে ; সে জগৎ কাব্যের মায়াচ্ছন্ন জগৎ, সেখানে তারা রচনা করে আপন নাচের চক্র, খোঁজে ভুলোকে দ্যুলোকে আপনার প্রকাশ,—'খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা, / খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর।' বিরাট বোবা এবার হয় ধ্বনিময়, বাণীময় ; তাদের নিত্যনব ভাবদিগন্ত অবারিত হয় ছন্দ-ভাষা-চিত্রকল্পের মায়া-মন্ত্রে, তাদের ভঙ্গি ইশারা নাচ সুরের ইন্দ্রজালে। তখন 'কথা'র আলো-দিয়ে-গড়া রূপের নটীদের বেষ্টনে লীলাভরে দাঁড়ায় রূপসী কবিতা, সম্পূর্ণ হয় বোবার বাণীরচনা।

এবার শোনা যাক বোবার ওই সন্ধানকে ঘিরে গদ্যে কবির কিছু ভাবনাচিন্তা। "ছন্দ" গ্রন্থে বলছেন কবি—'শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা···কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। ···আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে। ·····কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যেই ছন্দ। ···কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যেই ছন্দের দরকার।' পরে বলছেন কবি—ভাবের বিন্যাসেও নামে শ্রবণাতীত ছন্দ, গড়ে তোলে তার ছন্দোময় শিল্পিত রূপ।

কবিতায় যাকে কবি বললেন 'বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ', তার ভঙ্গি ইশারা নাচ সুর, গদ্যে তাকে বললেন—'তির্যক ভঙ্গি', 'বিশেষ গতি', 'আবেগের বেগ'। ওই বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ উজ্জ্বলিত হয়ে ভাবনাকল্পনাকে দেয় বিশাল ব্যাপ্তি, তখন সে বোধের সন্ধানব্যাকুলতার অন্তরে জাগে রূপের তৃষ্ণা, সৃজিত হয় ভাবলোকে তাদের বহুদ্যুতি ব্যঞ্জনার বিদ্যুৎ-ছটায় 'বোবার বাণী', রচিত হয় মহৎ কাব্য। মনে পড়ে "উৎসর্গ" কাব্যের 'আবর্তন' কবিতার চরণদুটি —'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, / রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।' ভাবের এই রূপতৃষ্ণা, রূপের এই ভাবদিগন্তে মুক্তিকামনা, বহু দিগন্তে মুক্তিকামনা—রয়েছে শ্রেষ্ঠকাব্যের অন্তরমূলে।

শ্রেষ্ঠ কাব্য তাই পাপড়িমেলা শতদলের মতো এক সুষমান্বিত রূপসৃষ্টি। 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'—অলংকার-শাস্ত্রের বচনটি সুবিদিত। ভাবধ্বনি ছন্দধ্বনি চিত্র-কল্পধ্বনি, নানা সূক্ষ্ম সুকুমার আঙ্গিকধ্বনি—বহুবিচিত্র

ধ্বনিতরঙ্গের সম্মিলিত প্রবাহে সাধিত হয় সে রূপসৃষ্টি। তাই মহৎকাব্য সৃষ্টিলীলার চিরন্তন বিস্ময়ের অঙ্গ হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বিস্ময়। সেই বিস্ময় জেগেছিল কীটস-এর অন্তরে গ্রীক পানপাত্রটির নীরবধ্বনি সুষমার সামনে দাঁড়িয়ে। ইংরেজি কাব্যে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর বিস্ময়-টলমল বাণী—'Thou silent form ! dost tease us out of thought / As doth eternity.'

কীটস-এর 'সাইলেন্ট্ ফর্ম্' শব্দটি আমাদেরকে পৌঁছে দেয় আর-এক জগতে। ওই 'ফর্ম্'-এরই পরিভাষা সুষমান্বিত রূপসৃষ্টি, আর সেই রূপসৃষ্টির দিকেই ইঙ্গিত করে আমাদের কবি লিখেছিলেন—'কবিতা, কল্পনা-লতা'। ভাবনা কল্পনা, ছন্দ ভাষা চিত্রকল্প, প্রতীকসৃষ্টি আঙ্গিকসৃষ্টি—কাব্যলোকের এই ত্রিজগৎকে ঘিরে, জড়িয়ে লতার মতো লীলায়িত হয়ে ওঠে সুন্দর কবিতা। তখন স্তবকে-স্তবকে বহু প্রতন্ন ব্যঞ্জনায় প্রাণময় হয়ে ওঠে সুন্দরীর রূপকল্পনা। তখন সে রূপলাবণ্যে উদ্দীপ্ত হয়, কখনো বা মায়াঘন হয় ওই 'সাইলেন্ট্ ফর্ম্', উন্মুক্ত হয় ইটার্নিটি-র নিত্যনব দিগন্ত। ভোরের আলোয় নেচে-ওঠা গোলাপ, যদি কান পেতে শুনি, আমাদের কিছু বলে; তেমন করে শুনলে, প্রকাণ্ড করে কিছু বলে। কিন্তু সেই বলার মাঝে অবাক হয়ে দেখি সে বলা তার পাপড়িগুলো মেলেছে, রূপে বর্ণে গন্ধে টলমল হয়ে উঠেছে কী অনিন্দ্য সুষমায়। সেই প্রকাণ্ড করে বলাই কীটস শুনেছিলেন পানপাত্রটির আশ্চর্য সুষমার অন্তরে, দেখেছিলেন ভাবনাহারা দিগন্তে ইটার্নিটি-র হাতছানি।

টি. এস. এলিয়ট এই ফর্ম্-এর অন্তরমূলে দেখেছেন 'a structural emotion', যা গড়ে তোলে কবিতার 'dominant tone', আর সে টোনকে রচনা করে 'a number of floating feelings, having an affinity to this emotion'। পরে বলছেন এলিয়ট তাদের ঘিরে জেগে ওঠে—'a new art emotion,··· ···a significant emotion'। 'দ্য নিউ ক্রিটিক্স্' গোষ্ঠীর অন্যতম কাব্যতত্ত্ববিদ্ জন র‍্যানসম কবিতার ফর্ম্-এর ভাবনাচিন্তায় আনবেন দুটি শব্দ—'texture', 'structure'। বস্তুনিষ্ঠতা (thingishness) অবয়বঘনত্ব (concreteness) বিস্পষ্টতা (vividness) ভাবঘনত্ব (solidity), রূপকের উজ্জ্বলতা, ব্যঞ্জনাময়তা—এদের সম্মিলিত ইন্দ্রজালে রচিত হয় কবিতার 'texture'। আর কবিতার স্তরবিন্যস্ত গঠনসুষমা, তার নির্মিতি-আঙ্গিকের সৌষ্ঠব গড়ে তোলে তার 'structure', যাকে এজরা পাউন্ড বলেছেন কবিতার 'architectonics', শিল্পিত স্থপতিরূপ।

আধুনিক কালে কবিতার স্বরূপ ও তার নির্মিতি সম্পর্কে মতভেদের অন্ত নেই পশ্চিমের প্রখ্যাত দুই কাব্যতত্ত্বসন্ধানী গোষ্ঠীর মধ্যে—'দ্য নিউ ক্রিটিকস্', 'দ্য শিকাগো ক্রিটিকস্'। তত্ত্বজটিল সে আলোচনাকে দূরে রেখে সংক্ষেপে বলা যাক, প্রথম গোষ্ঠী কবিতার স্তরে-স্তরে নির্মিতির কেন্দ্রভূমিতে দেখেছেন তিনটি ক্রিয়া—টেনশন, আয়রনি, প্যারাডকস। তাঁদের মতে (সেখানেও অনৈক্যের অভাব নেই), কবিতা এই ক্রিয়াত্রয়ীর রঙ্গভূমি, এদেরই ভূমিকার গভীরতায় ব্যাপকতায় নির্ণীত হয় কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব। শব্দের শুঙ্খলজালে কাব্যসুন্দরীদের বন্দী করার প্রয়াস চিরদিনই ব্যর্থ হয়েছে। "শেষ সপ্তক"-এর আর-এক কবিতার ভাষায়—'ওরা ছুটি-পাওয়া নটী, / ওদের উচ্চহাসি অসংযত, / ওদের এলোমেলো হেলাদোলা।' তবু সত্য নিশ্চয়ই রয়েছে ওই শব্দত্রয়ীর জগতে। শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হয় ভাবলোকে নানাস্তরীয় বিরোধ (টেনশন) সৃষ্টি করে। সে বিরোধের অন্তরে যখন জাগে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ, উন্মুক্ত হয় কবিতার বিশাল ভাবদিগন্ত, যখন সে তেজঃক্রিয়াকে দীপ্যমান করে তোলে অপর দুই কাব্যসাধনী, আয়রনি ও প্যারাডকস—তখন কাব্য পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন,

উত্তীর্ণ হয় সুমহান কাব্যলোকে।

দৃষ্টান্তে আসা যাক। 'আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ'—সৃষ্টিসম্মুখীন কবির অন্তহীন বিস্ময় জেগেছে ওই কবিতাটিতে, এবং বহুদিন পরে "পরিশেষ"-এর 'বিস্ময়' কবিতায়। সন্দেহ নেই, প্রথমটি উত্তুঙ্গ কাব্যলোক স্পর্শ করেছে, কিন্তু বিস্ময় কবিতাকে কাব্যের অবাক আকাশে উত্তীর্ণ করেছে 'ধূলির মহাক্ষুধা'র, 'সৃষ্টির বিরাট ধ্বংসধারা'র মাঝে দাঁড়িয়ে 'ললাটে অরুণটিকা'-লাভের অন্তহীন বিস্ময়ের টেনশন ও প্যারাডকস-এর পরে, 'নিখিলের জ্যোতিষ্কসভা'তলে 'হিমাদ্রির সাথে···সপ্তর্ষির সাথে', সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে নৃত্যোন্মত্ত রুদ্রের অষ্টহাস্যমুখরিত নাট্যলীলার পরে, দেশ-কাল-ইতিহাসের অশান্ত তরঙ্গে উত্তাল নিখিলবিশ্বের 'বিস্ময় অন্তহীন'-অভিভূত কবির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবনা, তার অভিঘাতে উজ্জ্বলিত অন্তিম দুটি ভাবস্তম্ভিত ছত্রের প্রচণ্ড আয়রনি—'জানি এ দিনের মাঝে / কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।' চরণদুটি জানিয়ে গেল ওই অন্তহীন বিস্ময়ের মাঝেও কালের অদৃশ্য চক্রের নির্মম ধ্বনি একদিন বাজবে, মিটাবে 'ধূলির মহাক্ষুধা'। সারা কবিতায় দেখি 'বিরাট ধ্বংসধারা'কে বেষ্টন করে বিরাটেরই মহাঙ্গনে বিরোধস্তম্ভিত কাব্যলোকসৃষ্টি। তার 'dominant tone' রচনা করেছে অন্তহীন বিস্ময়, দাঁড়িয়েছে কবিতার 'structural emotion' রূপে। তারপর ভেসে-আসা নিগূঢ় অনুভূতি-উপলব্ধি দুটি মধ্যস্তবকে সৃষ্টি করল যে 'new art emotion', তার ভাব-নিবিড় শীর্ষে দাঁড়াল ওই জানার আয়রনি।

শেষে বলে নেওয়া প্রয়োজন, বোধার বাণীরচনার ব্যাখ্যায় যে শব্দসম্ভার এল আমাদের আলোচনায়—ভাবধ্বনি ভাষাধ্বনি ছন্দধ্বনি চিত্রকল্পধ্বনি, প্রতীক ও রূপক-ধ্বনি, বহুস্তরীয় আঙ্গিকধ্বনি—এদের প্রত্যেকটি কাব্যলোকে এক-একটি অরণ্যময় জগৎ। বহু ছায়াঘন পথ কুটিল রেখায় মিলিয়ে গেছে তাদের বনবীথিতলে। তাদের ভঙ্গি ইশারা নাচ সুরকে, রূপ-সৃষ্টির বিশাল দিগন্তে তাদের বচনাতীত নানা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকে অন্তরে পূর্ণভাবে তুলে না নিলে সে পথ-রেখাবলীর অনুধাবন সম্ভব নয়। সে-অরণ্যানীর শেষ কথাটি পূর্বে বলা হয়েছে—'তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা।' সে কুহেলিকাকে ঘিরে কাব্যে নামে বাঙ্ময় নীরবতা। কাব্যলোকে চিরদিনই—'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে / বিরাট নিরুত্তর।'

কাব্যে বিরাট বোবার বাণীরচনার জগৎটার কিছু আভাস পাওয়া গেল। এবার আর-এক প্রসঙ্গে আসা যাক। এমনতরো জগৎটার সামনে দাঁড়িয়ে চিরপ্রশ্নের বেদীটাকে অবলীলায় অতিক্রম করে আমরা কত সহজেই না বিচারকের উচ্চ আসনটা জুড়ে বসি, কুণ্ঠিত হই না যথা-খুশি বিচারঘোষণায়। কত সহজেই না ভুলি, ওই ছলন-ছায়ার কুহেলিকার অন্তরালে লুকিয়ে আছে যেসব জগৎ তারা দাবি জানায় সে পরিচয়লাভের প্রয়াসে দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণ, এবং যা কোনো প্রশিক্ষণই দিতে পারে না—সংবেদনশীল চিত্ত, রসঘন অনুভূতি। দাবি জানায় এই প্রশ্নাবলীর পূর্ণাঙ্গ উত্তর—মহৎ কাব্য কাকে বলি? সে কাব্যে ছন্দ ভাষা চিত্রকল্প প্রতীকরচনার, তাদের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আঙ্গিকলোকের, তাদের ভঙ্গির, ইশারার, তাদের সমগ্র ইন্দ্রজালের স্বরূপ কী? এই প্রশ্নরাজির ভিত্তিমূলেই রচিত 'চিরপ্রশ্নের বেদী', আর তার চরম সত্য নিহিত শেষের কটি শব্দে—'চিরনির্বাক রহে / বিরাট নিরুত্তর।' তবু বলা যেতে পারে—দীর্ঘকালের প্রশিক্ষণ, সংবেদী চিত্ত, গভীর রসবোধ উত্তরগুলোকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এইসব অপরিহার্য দাবিদাওয়া থেকে দুর্ভাগিনী কাব্যলক্ষ্মী চিরদিনই বঞ্চিতা। আভিজাত্যহীন তাঁর বিচার-ঘর; সেখানে আসনপ্রলুব্ধ অর্বাচীনদের ঠেলাঠেলি লেগেই আছে, সেখানে যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নটা অবান্তর। তাই অনেক দুঃখে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখে-ছিলেন—'···যে মূঢ়তা কুটিল এবং উদ্ধত তাকে সহ্য

করা যায় না।' আর শেষ বয়সে লিখেছিলেন—সাহিত্যে 'রুচির বিচারে ধ্রুব আদর্শ নেই—অতএব যার যা খুশি বলতে পারে।'

সুতরাং কাব্যবিচারে স্বৈরাচার বহুকাল থেকে কাব্যলোকে এনেছে মূল্যবোধের যে ঘোর বিপর্যয় তাকে এক প্রকাণ্ড প্রহসন বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। মনে পড়ে "পুনশ্চ" কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটিতে মালতীর একটি উক্তি—'কাঁচাবয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে, / মন যায় না সত্যের খোঁজে, / আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।' এ আক্ষেপ বহুভাগ্যনিপীড়িতা কাব্যমালতীদের। মূল্যবিপর্যয়ের প্রসঙ্গে প্রথম উক্তিটিকে একটু বদলে বলা যাক—কাঁচা বুদ্ধির জাদু লাগে ওদের চোখে; আর 'আমরা' দাঁড়াক শ্রেষ্ঠ কাব্যের কণ্ঠে: তারা 'বিকিয়ে যায় মরীচিকার দামে।' কিন্তু সত্যটা আরও সর্বনেশে: কাব্যের হীরে বিকিয়ে যায় ঝুটো পাথরের দামে, আর চকমকে নকল হীরে বিকিয়ে যায় চড়া দামে। কাব্যবিচারে মূল্যবোধের এ মর্মান্তিক বিপ্লব, 'যার যা খুশি' বলার মস্ত প্রহসন মস্ত করেই অনুষ্ঠিত হয় সত্যের সস্তা শিরোপা পরে, বিশেষ করে আজকের দিনে।

আই. এ. রিচার্ডস তাঁর *Practical Criticism* গ্রন্থে কাব্যলোকে ছলন-ছায়ার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন সাধারণ্যের অপরিচিত কিছু কবিতা সম্পর্কে বহু পাঠকের অভিমত সংগ্রহ করে। এই মূল্যবিপর্যয়ের মূলে রিচার্ডস দেখেছেন কয়েকটি হেতু। প্রথম ও প্রধান হেতু: কাব্যবোধের, সংবেদনশীল চিত্তবৃত্তির দৈন্য। 'অরসিকেষু কাব্যনিবেদনং শিরসি' লিখন ঘটে এ দৈন্যসম্মুখীন কবির ভাগ্যে। এ দৈন্যের অপর প্রান্তে রয়েছে ভাষা ছন্দ চিত্রকল্প প্রভৃতি কাব্যের নানা সূক্ষ্ম অঙ্গ সম্পর্কে পাঠকের অজ্ঞতা। দুই, কবিতার ভাব রূপ রূপক প্রভৃতির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। তিন, ব্যক্তিগত অভিরুচির, মতামতের কষ্টিপাথরে কবিতার মূল্যায়ন যেখানে চলে পাঠকের নৈতিক আধ্যাত্মিক সামাজিক রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার ব্যক্তিগত দাবি। কাঁচা বুদ্ধির মরীচিকা ঘেরা জগৎটা কাব্যলোকে গড়ে তোলে প্রধানত এরাই।

ফিরে আসা যাক পূর্বে-উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নটির সামনে—মহৎ কাব্য কাকে বলি? কী তার চারিত্র-লক্ষণ? পুনরুক্ত হোক, চিরপ্রশ্নের নির্বাক বেদীসম্মুখে দাঁড়িয়েই এ প্রশ্নের উত্তরের প্রয়াস। এ পি ওয়ারেন বলেছেন—'The greatness of a poet depends upon the extent of the area of experience which he can master poetically'। মহৎ কবি তিনি যাঁর গহনচিত্তের অনুভূতি-উপলব্ধি, ভাবনাকল্পনা রচনা করে ভাবলোকে এক বিশাল জগৎ, যার অবাক আকাশে আঁকা পড়ে চিরন্তনের অনির্বচনীয় ইশারা। সে ইশারা কাব্যলোকে গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে যখন কবি রাজপ্রতাপে অধিকার করেন (master poetically) ছন্দ ভাষা, রূপক চিত্রকল্প, প্রতীক আঙ্গিকের জগৎটাকে। কবিতা তখন অবারিত করে কাব্যলোকের সীমাহারা দিগন্ত, উত্তীর্ণ সে লোকের অভ্রভেদী শৃঙ্গমালায়।

এবার দাঁড়ানো যাক কাব্যলোকের কঠিনতম প্রশ্নের সামনে: কোন্ মানদণ্ডে বিচার করব একটি কবিতা থেমেছে কাব্যলোকের কোন্ স্তরে এসে? তার ভালো কতখানি ভালো? পরীক্ষক পরীক্ষার খাতায় অঙ্ক বসান, পরীক্ষার্থীকে শ্রেণীভুক্ত করে তার ভাগ্য-বিধান করেন। বীণাপাণির কাব্যকাননে রুক্ষকেশী গণিতসুন্দরীকে দূরে রাখাই ভালো। কিন্তু কবিতার সম্মুখীন হয়ে দূরে ঠেলে রাখা যায় না এই প্রশ্নটি: কবিতাটি ঠিক কোন্ স্তরের—মন্দ? সাধারণ? ভালো? খুব ভালো? অসামান্য? বলা বাহুল্য, যেখানে পরিমাপের মানদণ্ডটাই টলমলে, যেখানে যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ বহুলাংশে ব্যক্তিগত রুচি- অনুভূতি-মানসিকতা-নির্ভর, সেখানে এসব প্রশ্নের সমাধানটা পৌঁছয় অসম্ভবের রাজ্যে। কিন্তু কাব্যের জগৎটাই যে গড়ে উঠেছে ওই 'অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে'।

কাব্যবিচারেও জেগে ওঠে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ, অসম্ভবের সামনে দাঁড়ায় কাব্যরসিকের পরিশীলিত পরিমার্জিত কাব্যদৃষ্টি, রূপদৃষ্টি।

সুতরাং প্রায়-অসম্ভবের প্রাঙ্গণে নেমেই কিছু প্রয়াস করা যাক কবিতার শ্রেণীগত মূল্যায়নের। (বলা বাহুল্য, সেটাও মূল্যায়নকারীর রুচি- ও অনুভূতি-নির্ভর।) একটু আগেই দেখলাম, ভাব-গৌরবে, কাব্যরূপসৃষ্টিতে 'আকাশ-ভরা সূর্য-তারা' কবিতার আসন সুউচ্চ কাব্যলোকে, কিন্তু ভাবনা-কল্পনার বিশাল ব্যাপ্তি, অন্তর্বিরোধের নিস্তল দিগন্ত, ভাব ছন্দ ভাষা চিত্রকল্প ও অশ্রান্ত কাব্য আঙ্গিকের অপরূপত্ব 'বিস্ময়' কবিতাকে দিয়েছে বিরাটের স্পর্শ, সুগভীর মহিমা তাকে উত্তীর্ণ করেছে সুমহান কাব্যলোকে।

এবার তুলনার প্রসঙ্গটা বিস্তৃত করা যাক পশ্চিমের কাব্যদরবারে। দিগন্তমেলা নির্জন মাঠ, তার মাঝে একা এক কিশোরী—ওয়র্ডস্বর্থ-এর "সলিটারি রীপার" এবং রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণকলি"—দুটি কবিতার পটভূমিকার আনুরূপ্য দৃষ্টি না টেনে পারে না। কিন্তু পার্থক্যটা তেমনি লক্ষণীয়: ওয়র্ডস্বর্থ মুগ্ধ হয়ে শুনছেন ধানকাটা পাহাড়ি মেয়েটির গান যার সুরের ঢেউ আকাশ বাতাস ভরে তুলেছে। মুগ্ধ কবি সে সুরতরঙ্গের রূপসৃষ্টি করছেন দুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ চিত্রপটে—

> No Nightingale did ever chaunt
> More welcome notes to weary bands
> Of travellers in some shady haunt
> Among Arabian sands:
>
> A voice so thrilling ne'er was heard
> In spring-time from the Cuckoo-bird,
> Breaking the silence of the seas
> Among the farthest Hebrides

কবিতার মর্মকেন্দ্রে দাঁড়িয়েছে স্তবকটি। ধানকাটা মেয়েটি রইল পটভূমির এক প্রান্তে, অনুচ্চারিত তার রূপ, তার গানের সুরের ইন্দ্রজালই হল কবিতার ভাবভূমি। সে ইন্দ্রজালে রচিত হল তুলনার ধ্বনি জাগিয়ে দুটি বৈষম্য-অতুল চিত্র: মানবিক ভূমিতে শ্রান্ত মরুযাত্রীদের মরু-উদ্যানে কোকিলের মধুর গানে অভ্যর্থনা; প্রকৃতিলোকে সুদূর নিঃসীম নির্জনতা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আর-এক পাখির গান। পাহাড়ি মেয়েটির গানের অনির্বচনীয়তাকল্পনায় রচিত হল তুলনার দুটি অপরূপ চিত্রপট।

পরের স্তবকে ভাবনায় নামল আর-এক বৈষম্য: কবি কল্পনা করছেন দিগন্তমেলা সুরতরঙ্গের অন্তরালে গানের কাহিনী: হয়তো সে কাহিনী অতীতের কোনো মর্মান্তিক দুঃখের সংগ্রামের ('For old unhappy, far-off things, / And battles long ago'); হয়তো তা আরও কাছের নিত্য-দিনের দুঃখকাহিনী কোনো ('Some natural sorrow, loss or pain, / That has been and may be again.')। প্রকৃতির বিশাল দিগন্তে জনহীন স্তব্ধতা, মানবপ্রাঙ্গণে অতীত ও নিত্যদিনের দুঃখময় কাহিনী—'গানের ভিতর দিয়েই কবি দেখলেন 'ভুবনখানি', সমাপ্ত হল সে গানের ইন্দ্রজাল-রচনা।

অন্তিম স্তবক ফিরে গেল প্রাথমিক চিত্রটিতে—"I saw her singing at her work, / And o'er the sickle bending'। কবিতা তার মায়াঘন পটসৃষ্টির শেষ রেশটুকু নিয়ে আঁকল ওই অন্তিম চিত্রটি। কিন্তু ঘটল না কোনো ভাবঘন শীর্ষে তার সমাপ্তি। দুটি পরিম্লান ছত্র জানাল—'The music in my heart I bore, / Long after it was heard no more.'।

"কৃষ্ণকলি" শুরু হল এক কিশোরীর নামকরণের উপর স্বরসংঘাতে—'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, / কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।' সে নামকরণ দাঁড়াল যে পুষ্পের রূপব্যঞ্জনা নিয়ে তা জানিয়ে গেল

মেয়েটিকে কালো বলায় তার রূপমাধুর্য ধরা দেবে না। সে মাধুর্যকে দিগন্তে মেলে দিলেন কবি পরের দুটি ছত্রে—'মেঘলা দিনে দেখেছিলাম মাঠে / কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।'

হঠাৎ আভাসে নামল অভাবনীয়ের চমক: মেঘলা দিনের মায়াঘন পরিবেশ, মাঠের বিস্তীর্ণতা—শুধুমাত্র চারটি শব্দে পটভূমি রচনা করে কবিতায় সংকেত এল কালো মেয়ের রূপকে বেষ্টন করে, মেঘলা দিনের মায়াময়তাকে দুই চোখে ভরে নিয়ে বিস্ময়ের ঢেউ তুলেছে তার কালো হরিণ-চোখ। সেই বিস্ময়ে কবি প্রাণহীন কালোত্ব থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণকলিকে দেখলেন তার প্রাণচঞ্চল কালো হরিণ-চোখের মায়ায়। তারপর শুনি—'ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে, / মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।' সরল কটি রেখায় আঁকা পড়ল কৃষ্ণকলির রূপকল্পনা। ছবিটির অপরূপত্ব—কালো হরিণ চোখের মায়াকে যেন মুক্ত দিগন্তে মেলে দিল গুণ্ঠনহীনার আলুলায়িত কেশদাম। স্তবকের শেষে প্রথম ছত্রদুটি ফিরে এল কবিতার ধুয়া রূপে, জানাল কবিতার ভাবকেন্দ্রে আসন মেলেছে ওই কালো হরিণ-চোখের মায়াঘন দৃষ্টি। তারপর সে ভাবনা নিবিড় হল পরের স্তবকে—

> ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
> ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
> শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
> কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।
> আকাশপানে হানি যুগল ভুরু
> শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
> কালো? তা সে যতই কালো হোক
> দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

ঘনায়মান অন্ধকারে এবার নেমে এল সদ্য মুহূর্তের প্রাণচঞ্চল একটি চিত্রপট, ব্যস্ততা ত্রস্ততা রচনা করল তার ভাবভূমি। তার পরেই ভাবনা পাড়ি দিল ওই আকাশঘেরা অন্ধকারে, আঁকল কালো হরিণ-চোখের দৃষ্টিকে আবার দিগন্তে মেলে দিয়ে বিরলরেখ একটি ছবি—'আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু / শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু।' দৃশ্যরূপ, ধ্বনিরূপ জাগিয়ে কালো হরিণ-চোখের দৃষ্টি এবার নিবিড়ঘন হল আকাশ-পানে হানা যুগল-ভুরুর কালো ছায়ার পরিবেষ্টনে।

ভাবপট বদলাল তৃতীয় স্তবকে। কবিতায় নেমে এল প্রকৃতির মায়ালোক, তার পটভূমিতে রচিত হল বাস্তব জীবনের এক নাট্যঘন মুহূর্ত। কবিতায় শুনি—

> পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
> ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ,
> আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
> মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
> আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
> আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।
> কালো? তা সে যতই কালো হোক
> দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

আবার দুটি বিরল রেখায় ফুটে উঠল হঠাৎ ধেয়ে-আসা পুবে বাতাসের ঢেউ-খেলিয়ে-যাওয়া চিত্রটি। পরমুহূর্তে কবিতা নেমে এল মানবিক ভূমিতে, পটভূমিতে দাঁড়াল একাকিত্ব, নির্জনতা। তারপরেই এল নাট্যঘন মুহূর্তটি যার নিঃসীম দ্যোতনা ব্যাখ্যায় ধরা যাবে না—'আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে / আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।' কাব্যতরঙ্গিণীতে অর্থসংকেত ভেসে আসে অশ্রান্ত ঊর্মিমালার মতো। কিন্তু ঊর্মিশিখরে যখন বচনাতীতের শুভ্রফেনকিরীট ঝলমল করে ওঠে তখনই তরঙ্গিণী হয় আশ্চর্যসুন্দর। আকাশে নেমে-আসা আঁধার, পুবে বাতাসে ধেয়ে আসা ঢেউ যেন বেষ্টন করে দাঁড়াল চরণদুটিকেও, তাদের অর্থসংকেত মিলিয়ে গেল সে-অন্ধকারে, ভেসে চলল সে ঢেউয়ের দোলায়। অর্থটা বোধ হয় এই: সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনায় বিভাসিত হল দুয়ের মাঝে অনুরাগের একটি রেখা। কবির অনুরাগের আভাস পেয়েছি পূর্বে কৃষ্ণকলি নামকরণে; কিন্তু আর-এক আভাস শুধু না-বলা কথার অনির্বচনীয়তায় অনিন্দ্য হল ওই দুটি চরণে—কিশোরী হয়তো তার কালো-হরিণ চোখ তুলে কবিকে দেখেছিল, হয়তো সে চোখেও অনুরাগের

অঞ্জন লেগেছিল। সে দুটি 'হয়তো' রইল দুয়ের অন্তরে জানার অতল তিমিরে লুপ্ত হয়ে। শুধু আমরা দেখলাম ভেসে-আসা ঢেউয়ের বুকে বচনাতীতের শুভ্রকিরীট, দেখলাম মহৎ কাব্যে ব্যঞ্জনার অতুল বৈভব কোন্ দিগন্তে ঝলমল করে ওঠে।

ওয়র্ডস্বর্থ এর কবিতা সুরতরঙ্গের রূপভাবনায় রচনা করেছিল প্রকৃতি ও মানবলোকে দুটি অসামান্য চিত্রপট। কিন্তু কবিতা থেমে গেল সেইখানেই, পৌঁছল না কোনো নাট্যঘন শীর্ষে। কৃষ্ণকলি নিয়ে দাঁড়াল সেই নাট্যময়তা। তারপর অন্তিমপূর্ব স্তবকে সে নাট্যময়তা বিস্তীর্ণ হল সদ্য মুহূর্তের বাস্তবলোক থেকে প্রকৃতির বিপুল দিগন্তে, রচিত হল হরিণ-নয়নার আকাশপানে যুগল ভুরু-হানা দৃষ্টির উপমান—

> এমনি করে কালো কাজল মেঘ
> জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশান কোণে।
> এমনি করে কালো কোমল ছায়া
> আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।
> এমনি করে শ্রাবণরজনীতে
> হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
> কালো? তা সে যতই কালো হোক
> দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

ছত্রে-ছত্রে নামল বিশাল কল্পনার ইন্দ্রজাল, ছত্রে-ছত্রে কৃষ্ণকলির কালো চোখের মায়া নিবিড় হয়ে চলল প্রকৃতির মায়াঘন দিগন্তে, স্তবকে নামল বিরাটের স্পর্শ, সৃজিত হল মেঘলোকে উধাও কাব্য-লোক। হয়তো পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ত্রিরুক্ত 'এমনি করে'র যৌক্তিক পারম্পর্য। আকাশপানে হানা দৃষ্টির উপমান হয়ে এল জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশান-কোণে ঘনিয়ে-আসা কালো কাজল মেঘ। সে দৃষ্টি নেমে এসেছিল আকাশ থেকে আলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা 'আমার পানে'; দৃষ্টির সে ছায়াচ্ছন্ন অবতরণের উপমান হল দ্বিতীয় চিত্রপটটি—'এমনি করে কালো কোমল ছায়া / আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।' শেষে 'আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে'—দুই জানার অতল থেকে ঘনিয়ে-আসা খুশির কাঁপন ধরা দিল পরের দুটি ছত্রে, যেখানে মায়ানিবিড় চিত্রকল্পটি দাঁড়াল প্রকৃতি ও মানবচিত্তলোকে সমান্তরালে পদরেখা এঁকে। শেষে সমগ্র ভাবতরঙ্গের শীর্ষে দাঁড়াল কবিতার ধুয়াটি।

অন্তিম স্তবক ফিরে গেল কবিতার প্রথম উক্তিতে, কিন্তু এই পুনরুক্তি ঘটল নামকরণে স্বরাঘাতকে আরও তীব্র করে—'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, / আর যা বলে বলুক অন্য লোক।' তারপরে দেখি অপরূপ ব্যঞ্জনার ঢেউ তুলে পূর্বের 'মেঘলা দিনে দেখেছিলাম মাঠে' ফিরে এল নামের অলংকার প'রে—'দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে'। নামকরণের ধ্বনির অন্তরে কোথায় যেন বিভাসিত হল ছায়াচ্ছন্ন এক মায়ালোক। "সাহিত্যের পথে"-র 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে বলছেন কবি—'সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হয়। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গী।' ময়নাপাড়ার মাঠে—নামটি দাঁড়াল যে শব্দ-ধ্বনি তুলে তা তথ্যসীমাকে ফেলে রেখে কবিতায় এল অসীমের প্রকাশরূপ নিয়ে। তারপর মিলিয়ে গেল কালো হরিণ-চোখের দৃষ্টির অতলে।

সবশেষে আসা যাক তুলনার প্রসঙ্গটায়। ওয়র্ডস্বর্থ-এর কবিতা গানের সুরতরঙ্গের রূপভাবনায় রচনা করেছিল প্রকৃতি ও মানবলোকে কটি মায়াঘন চিত্রপট। ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই, পাহাড়ি মেয়ের গানের মায়ালোক আর কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখের মায়ালোক—দুটি কবিতায় যে কাব্যরূপ পেল তাদের মাঝে কী দুস্তর ব্যবধান। সে চোখের 'অগম গোপন গহন মায়ায়' যে ভাবনাহারা নিস্তলতা, তার দৃষ্টির উপমান হয়ে এল যে ভাবস্তম্ভিত চিত্রাবলী, ওয়র্ডস্বর্থ-এর গানের মায়ালোক রইল তার অনেক নীচে। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণকলির গুণ্ঠনহীন মুক্তবেণীরূপভাবনা, পরে মানবিক ভূমিতে দ্রুতপরিবর্তমান চিত্রপটরচনা, অনুরাগের রহস্য-অতুল নাট্যঘন ব্যঞ্জনাধ্বনিরচনা, শেষে মেঘলা-

দিনের ছায়াঘন প্রকৃতিকে আর কালো হরিণ-চোখের দৃষ্টিকে বিশাল দিগন্তে মেলে দিয়ে ঘননিবিড় মায়া-লোকরচনা—"কৃষ্ণকলি" ওয়র্ডস্বর্থ-এর বিশ্রুত কবিতা-টিকে বহু যোজন অতিক্রম করে কাব্যলোকের অভ্রভেদী শিখরে উত্তীর্ণ হল না কি? সে উত্তরণে দেখলাম কাব্যে বিরাট বোবার বাণীরচনায় কল্পনার বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ অন্তরে তুলে নিয়ে ভাব-লোকের বিপুল দিগন্তে ছন্দ ভাষা চিত্রকল্পের, নানা প্রত্যঙ্গ আঙ্গিকের ভঙ্গি, ইশারা, নাচ, সুর। দেখলাম কীটস-এর 'সাইলেনট ফর্‌ম্‌' বাণীরূপ পেয়েছে, তারপর রূপে লাবণ্যে সুষমায় গোলাপের মতো টলমল করে উঠেছে। সে টলমলে রূপ চিরদিন সৃষ্টির চিরবিস্ময় হয়ে কাব্যলোকে জেগে থাকে চির-প্রশ্নের বেদীর সামনে চিরনির্বাক উত্তর নিয়ে।

প্রসঙ্গ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবনী

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসে আগ্রহ থেকেই আসে জীবনীগ্রন্থ রচনা ও পাঠে তাগিদ। এদেশে তাগিদ এসেছিল ইতিহাস-চেতনার সূত্রে উনিশ শতকে। তার আগে জীবনীগ্রন্থ যে এদেশে রচিত হয় নি তা নয়। রাজাবাদশার জীবনকথা রচিত হয়েছে তাঁদেরই হুকুমে। চৈতন্য এবং চৈতন্যপরিকরদের জীবনীগ্রন্থের কথাও আমাদের জানা আছে। মানুষের সম্বন্ধে আগ্রহ থেকে এগুলি রচিত হলেও, যাঁদের নিয়ে এসব গ্রন্থ রচনা, তাঁরা ছিলেন অসাধারণ বা দেবোপম। এসব গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া গেছে বটে, তবে সচেতন ইতিহাস-চর্চার কারণে এগুলি রচিত হয় নি। তা শুরু হয়েছে উনিশ শতকে। কিছু বিদেশীয় জীবনী, কিছু দেশীয়। একদিকে মাতসিনি-গারিবলদির জীবনকথা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্রর জীবনীসূত্রে সাহিত্যের নতুন পাঠ। কিন্তু সেসব জীবনীতে উচ্ছ্বাসের আধিক্য ছিল, ছিল না তথ্যের যথার্থ সমাহার এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। দেশপ্রেমের উন্মেষলগ্নে উচ্ছ্বাসের আধিক্য অকল্পনীয় নয়, তথ্যের অভাবও এদেশে অলঙ্ঘনীয়। পরিবর্তিত অবস্থায় দেশপ্রেমজনিত উচ্ছ্বাস প্রশমিত হয়েছে, প্রভূত গবেষণায় তথ্যের ঘাটতিও অনেকটা পূরণ হচ্ছে, কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি—তা কি এখনও তৈরি হয়েছে?

যে-কোনো জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ হাতে এলেই এই প্রশ্নটি মনকে নাড়া দিয়ে ওঠে। জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ রচনার একটা সহজ সুযোগ এনে দেয় ব্যক্তিবিশেষের জন্মশতবর্ষের উপলক্ষ। স্বল্পায়ু ব্যক্তির ক্ষেত্রে জন্ম-শতবর্ষের দীর্ঘ ব্যবধান তথ্যাভাবের অধিক কারণ ঘটিয়ে থাকে, অধিকন্তু সমসাময়িক ব্যক্তিসমূহের স্মৃতিচারণের সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও যায় কমে। দীর্ঘায়ু ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদিও এসবের আশঙ্কা কম, কিন্তু সেখানে যদি আলোচ্য ব্যক্তি স্বভাবত আত্ম-প্রচারে উদাসীন হন এবং অপ্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মে যদি তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল কাটে, তাহলে সেরকম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা সহজ-সাধ্য কর্ম নয়। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবনী রচনা সেই কারণেই সহজসাধ্য নয়। একে তিনি স্বভাববশে আত্মপ্রচারবিমুখ, তায় রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁকে কারান্তরালে বা আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে দীর্ঘকাল। ফলে তাঁর জীবনের তথ্যসংগ্রহ খুব সহজ কাজ নয়। সহজ কাজ যে নয় তার প্রমাণ তাঁর জন্ম-তারিখটি পর্যন্ত একটা মেনে-নেওয়া তারিখ।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সংক্রান্ত তিনটি বই হাতে এসেছে—"সঙ্গ ও প্রসঙ্গ", "জীবন ও বৈশিষ্ট্য" আর "বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন"। এরই সূত্রে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবন আলোচনা। প্রথমটি বহুজনের স্মৃতিচারণের সংকলন, বাকি দুটোকে জীবনীগ্রন্থ বলা যেতে পারে। প্রথম দুটি বেরিয়েছে কলকাতা থেকে, তৃতীয়টি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জন্মস্থান সন্দীপ থেকে। তিনখানি বইয়ের ক্ষেত্রেই আলোচনাপদ্ধতির পার্থক্য স্পষ্ট। মজহারুল ইসলাম-সম্পাদিত গ্রন্থে "সঙ্গ"

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ: সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—সম্পাদনা মজহারুল ইসলাম। নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা-৭। ১৯৮৯। পঞ্চাশ টাকা।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জীবন ও বৈশিষ্ট্য—জিয়াদ আলী। প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলিকাতা-৯। ১৯৮৯। চল্লিশ টাকা।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন—হাসান মোহাম্মদ সন্দীপ এডুকেশন সোসাইটি, চট্টগ্রাম। ১৯৮৯। পঞ্চাশ টাকা (বাংলাদেশ)।

বিভাগে ছাব্বিশটি এবং "প্রসঙ্গ" বিভাগে পঁচিশটি রচনা, এর মধ্যে ছটি আবার মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে নিবেদিত বা তাঁকে মনে রেখে রচিত কবিতা, এ ছাড়া মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বিবৃতির অংশবিশেষ। "সঙ্গ" বিভাগের রচনাগুলি মূলত ব্যক্তিগত স্মৃতি, কোনো-কোনোটির সূত্রে মূল্যায়নও রয়েছে। কিন্তু "প্রসঙ্গ" বিভাগের বেশ কয়েকটি রচনা "সঙ্গ" ছেড়ে "প্রসঙ্গে" স্থান পেল কী করে তা বোঝা গেল না। এস. এ. মাসুদ, সুমন্ত হীরা বা সুপ্রিয়া আচার্যের রচনা স্মৃতিচারণ নয় কোন্ অর্থে। সম্পাদকের ব্যাখ্যা 'প্রত্যক্ষ পরিচিত মানুষজনের স্মৃতিকথা' আর 'কার্যপ্রণালী, মতবাদ চরিত্র বিষয়ে আলোচনা'র বিভাগকে মেনে নেওয়া কঠিন। হয়তো সময়মতো লেখাগুলি এসে পৌঁছয় নি বলেই "সঙ্গ" বিভাগে যেতে পারে এমন রচনা "প্রসঙ্গে" ঠাঁই পেয়েছে। তবে বিভাজনের নীতিতে যে ত্রুটিই থাক, কয়েকটি রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়। সুধী প্রধান, গোপাল হালদার বা বিনয় ঘোষের রচনা তো বটেই, সম্পর্কে নাতি মাহফুজউল্লাহের রচনায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পত্রের অংশবিশেষ যা উদ্‌ধৃত হয়েছে তার মূল্যও কম নয়, আবুল ফজলের রচনাতেও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ব্যক্তিত্বের অনেক অজানা প্রসঙ্গ রয়েছে, যেমন রয়েছে সুপ্রভা সরকারের আবেগময় স্মৃতিকথায়।

সংকলনটিতে নানা পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থ থেকে রচনা বেছে নেওয়া হয়েছে। কোথায় পড়েছিলাম মনে পড়ছে না, অতুলচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের আত্মগোপন-কালের একটি রাতের কাহিনী। এ সংকলনে স্থান পেলে সংকলনটির মর্যাদা বহুলাংশে বাড়ত মনে হয়। রাতের অন্ধকারে কলকাতার একটি পার্কের বেঞ্চিতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ মুড়ি চিবোচ্ছিলেন—এ অবস্থায় অতুলচন্দ্র তাঁকে দেখে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। শেষরাত্রে সযত্নে রাখা তাঁর সঙ্গের পুঁটলিটি যখন ফেরত চাইলেন গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে তখন জানা গেল সেই পুঁটলিতে অনেক টাকা ছিল। টাকা থাকা সত্ত্বেও শুক্‌নো মুড়ি চিবোচ্ছিলেন কেন, এ প্রশ্ন করাতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জবাব দিয়েছিলেন, 'ও টাকা তো আমার নয়, পার্টির। কেমন করে ভাঙি।' আশ্চর্য পার্টি-আনুগত্য এবং সততা।

হাসান মোহাম্মদের জীবনীটি আকারে ক্ষীণকায়। লেখক ভূমিকায় লিখেছেন, 'কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও তাঁর রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের অনেক দিকের সাথে অনেকে একমত হবেন না। আমিও একমত নই।' তবু তিনি যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবনী অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন, তার কারণ বোধহয়, 'মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জন্মস্থান "সন্দীপ" আমারও জন্মস্থান। আশৈশব তাঁর নাম ও নানা কীর্তির কথা শুনে আসছি। এসব কারণে স্বাভাবিকভাবেই···তাঁর জীবনের নানা দিক সম্পর্কে জানতে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি।' একুশটি অধ্যায়ে লেখক নানা সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য সাজিয়ে দিয়েছেন গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে। শুরুতেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জন্মতারিখ নিয়ে যে তথ্য দিয়েছেন তা কোনোদিন পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হলে সুনিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা হবে। যেহেতু লেখক বাংলাদেশে বসে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেজন্য জীবনের প্রথম অংশের অনেক তথ্য সংগ্রহ তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে। যেমন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে লেখা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পত্র তিনি পেয়েছেন আহ্‌মদ শরীফের সংগ্রহ থেকে। একটি অধ্যায়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের রচিত প্রবন্ধ, গ্রন্থ, ভূমিকা, এমন-কী কবিতারও একটি অসম্পূর্ণ পঞ্জি দেওয়া হয়েছে। অসম্পূর্ণ হলেও তালিকাটি খুবই কাজের সন্দেহ নেই। এমন অনেক তথ্য এ গ্রন্থে আছে যার সূত্র ধরে বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন আবুল ফজলের "রেখাচিত্র" থেকে

উদ্‌ধৃত করা হয়েছে যে সুভাষচন্দ্র একদা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। হাসান মোহাম্মদ নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্যসংগ্রহের আগ্রহে তিনি কোন্‌টা কতখানি জরুরি তা সর্বত্র বিচার করেন নি। নইলে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" শ্লোগানটি ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে কে প্রথম প্রয়োগ করেন, তার আলোচনা করতেন, অথবা 'কাকাবাবু' এই ডাকের উৎস সন্ধান করতেন। আবার ১৯৪৮-১৯৫১ সালের ঘটনাকে কয়েক ছত্রে শেষ করতেন না।

জিয়াদ আলীর 'জীবন ও বৈশিষ্ট্য' প্রাসঙ্গিক আলোচনাটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে। জিয়াদ আলীর ভাষায় যে আবেগময়তা আছে, হাসান মোহাম্মদে তা একেবারেই অনুপস্থিত। তবে জিয়াদ আলীর আবেগময়তা তথ্যভিত্তিকে বিপর্যস্ত করে নি। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ 'বৈশিষ্ট্য' অংশে শুধু রাজনৈতিক আদর্শের ব্যাপারে নয়, বাঙলা গদ্যরীতিতে বা শব্দ-চেতনার ক্ষেত্রে, গবেষণাপদ্ধতিতে নির্ভুল তথ্যবিচারে আত্মসংশোধনের ক্ষেত্রে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যে বৈশিষ্ট্য লেখক তুলে ধরেছেন সেখানেই এ গ্রন্থটি একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। দুটি পরিশিষ্টে কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাও নজরুলগবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্বন্ধে গোপাল হালদার মশাই আক্ষেপ করেছিলেন 'বাংলাদেশের বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত করলেন। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর একখানা ছোট জীবনীও আজ অবধি প্রকাশিত করেন নি।' গোপালবাবুর আক্ষেপের পর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রসঙ্গে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, তবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও রচিত হয় নি। তিনি নিজে "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে গ্রন্থও তিনি অভিপ্রেতভাবে শেষ করে যেতে পারেন নি এবং সেখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসই লক্ষ্য, "আমার জীবন" সেখানে অনুষঙ্গমাত্র। একদা ভারতের জাতীয়তাবাদীদের জীবনীকোষ রচনার সূচনাকালে যেসব দেশপ্রেমিকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, সেখানে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নাম ছিল না, পরে তা যদিও সংশোধিত হয়। বর্তমানে অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীরও এখন প্রত্যাশা দেখা যাচ্ছে। হয়তো যোগ্য ব্যক্তির হাতে সে জীবনী রচিত হবে, তখন আলোচ্য তিনটি গ্রন্থের উপাদানই কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তবু ঘাসফুলে প্রজাপতি

জাহারউদ্দিন খান্

একজনের কাজের ফিরিস্তি তার জন্মমৃত্যু, সাফল্য-অসাফল্য সবকিছু আর-একজন লেগে—এটি হল জীবনী। অন্যজনে নিজের ফিরিস্তি নিজেই লেখে—সেটি হল আত্মজীবনী। জীবনী লেখা হয়ে থাকে তিনটি উপায়ে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্ম বংশপরিচয় লেখাপড়া কাজকারবার ইত্যাদি সাল-তারিখ দিয়ে জীবনী লেখার প্রথম সূত্রপাত হয়। এই ধরনের জীবনীতে ব্যক্তির কঙ্কালকে পাওয়া যায়, কিন্তু ভেতরের রক্তমাংসের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভেতরের মানুষটিকে যাতে পাওয়া যায় সাল-

কাঁটাতারে প্রজাপতি—সেলিনা হোসেন। ঢাকা, জাতীয় সাহিত্যপ্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯। নব্বই টাকা।

তারিখ-কণ্ঠকিত না ক'রে আন্দ্রে মরিস ব্যক্তির অন্তর্জীবনের নির্যাসকে ধীরে এক ধরনের জীবনী-লেখার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন—শেলি, বায়রন, ডিজরেলি এই রীতির অন্যতর দৃষ্টান্ত। জীবনী-রচনার আপাত শেষ রীতি দেখালেন আরভিঙ স্টোন—শিল্পী ভ্যান গগের জীবন নিয়ে *Lust for Life* (1934) লিখে।

এই তৃতীয় পদ্ধতি, অর্থাৎ জীবনীকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করা আমাদের বাঙলা সাহিত্যে বোধ করি মদন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এনটনী কবিয়ালকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এরপরই গোলাম কুদ্দুস গায়ক কে. মল্লিককে নিয়ে "সুরের আগুন" নামে এক অত্যাশ্চর্য উপন্যাস লিখেছিলেন। এই ধারার এ পর্যন্ত সর্বশেষ অসমাপ্ত উপন্যাস রামকিংকর বেইজকে নিয়ে সমরেশ বসুর "দেখি নাই ফিরে"। বাংলাদেশে সত্যেন সেন আলবেরুনীকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন—প্রকাশকাল ১৯৬৯, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। সেলিনা হোসেনের "কাঁটাতারে প্রজাপতি" এই ধারার কাছাকাছি উপন্যাস। কৃষক-আন্দোলনের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রকে নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে।

গোলাম কুদ্দুস ইলা মিত্রকে কবিতার মাধ্যমে কিংবদন্তীর নায়িকা করে তুলেছিলেন। তারপর সোমনাথ লাহিড়ী "পরিচয়" ১৩৬৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ইলা মিত্রের ওপর পাক পুলিশের নারকীয় অত্যাচার কাহিনীকে "কামরু ও জোহরা" নামক গল্পে তুলে ধরেন। এই গল্পটি পরে তাঁর "কলিযুগের কাহিনী" গ্রন্থে সংলগ্ন হয়েছে। সেলিনা হোসেনও তাঁর উপন্যাসে ইলা মিত্র তৎকালীন পাক কারাগারে কিভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন সে চিত্র দিয়েছেন। ইলা মিত্র জমিদার-বাড়ির বউ হয়ে স্বামী রমেন মিত্রের সঙ্গে কিভাবে কৃষক-আন্দোলন পরিচালনা করে নেত্রী হয়ে উঠলেন, সেই নাটকীয় ঘটনা লেখিকা রূপায়িত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

ইলা মিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাস গড়ে উঠলেও ইলা মিত্র গ্রন্থের প্রথমে আসেন নি। উপন্যাসের গোড়াতেই দেখা যাচ্ছে যে, শিবগঞ্জ হাটে সুতো বিক্রি করে আজমল বেশ ভালো পয়সা পেয়েছে। এই সুখবর দেবার জন্য সে তার মামাতো ভাই আজিজের কাছে যাচ্ছে। আজমলের বাপ ইয়াসিন বসনি সুতোর প্রধান কারবারি হলেও সে বেশ বড়ো জোতদার, ষাট বিঘে জমিতে তুঁতে চাষ করে—রেশমের গুটিপোকার প্রধান খাদ্য তুঁতে গাছের পাতা। গুটিপোকা যেখানে রাখা হয় তাকে পলুঘর বলে। এই পলুঘরে পোকার চাষ কিভাবে করতে হয়, কত সতর্কভাবে সুতো বের করতে হয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। এই পোকাকে কেন্দ্র করেই এক-একটি সংসার চলে। ইয়াসিন বসনির ভালো সুতো তৈরি করার বিষয়ে বেশ নাম আছে—সে নাম প্রধানত তার রক্ষিতা আছিয়ার জন্যই। আজমলের জন্মকালে তার মা মারা যাবার পর ইয়াসিনের ছোটো স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও জমিরুদ্দিনে বিধবা পত্নী আছিয়াকে সে রেখেছে। আজমল মামাঘরে মানুষ—মামাতো ভাই আজিজের সঙ্গে তার হৃদ্যতা রয়েছে। আজিজ কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। আজিজের গ্রামেই সে শোনে নাচোলের জমিদার কৃষক-আন্দোলনের নেতা রমেন মিত্র কলকাতায় বিয়ে করতে গেছে এবং এই উপলক্ষে সারা গ্রামে আমোদ-উৎসবের ঢেউ উঠেছে। এই আনন্দোৎসবে হিন্দু মুসলমান আদিবাসী সবাই মেতে উঠেছে। গ্রামে ইলা মিত্রের বধূরূপে প্রবেশ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা। গ্রামবাসীর সারল্য আর আন্তরিকতা ইলা মিত্রকে স্পর্শ করে, এবং আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে 'রানীমা' নামে সকলের কাছে প্রিয় হয়ে পড়ে। প্রধানত মিত্র-দম্পতির নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন, জমি দখলের আন্দোলন সারা অঞ্চলের জোতদারের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। আন্দোলনের

সাথে-সাথে সাঁওতালদের জীবনযাত্রা এবং মুসলমান সমাজে তার প্রতিক্রিয়া বেশ নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান জোতদার একত্রিত হয়ে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়িয়েছে, তারও বর্ণনা আছে। আন্দোলন চলার সময় দেশভাগ হয়ে যায়। কিন্তু মিত্র-দম্পতি পালিয়ে না গিয়ে আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য অনেক অত্যাচার সয়েও রয়ে গেলেন। ইলা মিত্র সাঁওতালদের মধ্যে ছদ্মবেশে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য সে সময়কার পাকিস্তান সরকার অমানুষিক অত্যাচার করে। সাঁওতালদের নেতা হরেক মাতলাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ওদিকে ইয়াসিন বসনির কন্যা জোহরার সঙ্গে কুতুবের ভাব-ভালোবাসা হয়। ইয়াসিন জোহরার বিয়ে অন্যত্র দেয় এবং জোহরা আত্মহত্যা করে, কুতুবও পাগল হয়ে যায়। পাগলামি যাতে ভালো হয় সেজন্য তার বিয়েরও ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু বিয়ের রাতেই কুতুব বউকে গলা টিপে মেরে ফেলে এবং পাগলের যাবতীয় লক্ষণ তার মধ্যে দেখা দেয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে—জেলেও কিছুদিন রাখে, তারপর তাকে ছেড়ে দেয়। রাস্তায়-রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে-ঘুরতে একদিন আছিয়ার ঘরে আসে এবং দা দিয়ে ইয়াসিন বসনির মুণ্ডচ্ছেদ করে। পিতার এই পরিণামের জন্য পুত্র আজমলের মনে কোনো দুঃখ নেই, বরং তার সহানুভূতি কুতুবের দিকে। কুতুবের এই অবস্থার জন্য তার পিতাই যে দায়ী, একথাই তার মনে হয়েছে। কুতুব একটি অদ্ভুত চরিত্র। এরকম আর-একটি চরিত্র হচ্ছে ছমির আলি। তাকে তার পুত্র রতন, পুত্রবধূ তারাবানু দেখতে পারে না, সে আলাদা থাকে, তবু পুত্রের প্রতি তার স্নেহ ঝরে পড়ে। পুত্রকে তার বউ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, ছমির আলি তার দেখা-শোনা করে। এই অসহায় অবস্থাতেও পুত্র পিতাকে শাপশাপান্ত করে। ছমির আলি রাগ করে না, বরং কৌতুক উপহাস করে। তার মধ্যে পার্থিব জগতের যাবতীয় দুঃখকষ্টবেদনাকে উপেক্ষা করার এমন এক শক্তি ছিল, এবং সব সময় হাসিখুশি থাকার এমন এক সহজাত ক্ষমতা সে আয়ত্ত করে-ছিল যার ফলে চরিত্রটি সমগ্র বইয়ের মধ্যে পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। আজমল হোসেনের চরিত্রও কম আকর্ষণীয় নয়—সে আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছে কিন্তু পারে নি। আজিজের বাপ জোতদার নাসির আলি পুত্রকে তাড়িয়ে দিয়েছে; বিতাড়িত হবার আগেই আজিজ বাপের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। গরিব মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে আজিজের উৎসর্গীকৃত জীবন আজমলকেও আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনেছে। আজমলও পুলিশের অত্যাচারে মারা যায়।

যশোহরের ঝিনাইদহের নগেন্দ্রনাথ সেনের কন্যা ইলা মিত্র লেখাপড়া আর খেলাধুলায় চৌকস মেয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। বিয়ে হয়ে আসার পর বাড়ির বউ আন্দোলন করে বেড়ায়, ইলা মিত্রের শাশুড়ির মনঃপুত ছিল না। কিন্তু স্বামী রমেন মিত্র ইলা মিত্রকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ইলাও যেন এইসব নিরন্ন দুঃখী মানুষের আপনজন হয়ে যেতে পারেন। গায়ে কনের গন্ধ যেতে না যেতেই তিনি আন্দোলনের মাঝে নেমে আসেন। গ্রামে নারীশিক্ষাপ্রসারকল্পে অবৈতনিক স্কুল এবং পড়ুয়াদের জন্য বইখাতা পেন্সিল সরবরাহ ও শিক্ষিকার কাজও করেছেন। স্বাভাবিকভাবে গাঁয়ের জোতদার শ্রেণী বিরুদ্ধাচরণ করেছে। কলকাতার ১৬ অগস্টের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া দেশের চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে—নিজের অঞ্চলে যাতে কোনোরকম দাঙ্গা না বাধতে পারে সেদিকে সবাই সতর্ক থেকেছে। দেশভাগের পর ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি রমেন মিত্রের মা।

আন্দোলন থেমে থাকল না। তেভাগা জোতদার-জমিদারদের শিরদাঁড়া নুইয়ে দিয়েছে। সে সময় বি. টি. রণদিভের লাইনে কমিউনিস্ট পার্টি হাঁটছে। কয়েকটি কথার মাধ্যমে পার্টির লাইন লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন, 'বি. টি. রণদিভে বলেছিলেন, এতদিন আমরা সংস্কারপন্থী পথে অগ্রসর হয়েছি, বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি করেছি। স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারি নি। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমঝোতার ভিত্তিতে তথাকথিত স্বাধীনতা এনেছে। এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়—ইয়ে ঝুট আজাদি হ্যায়। যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার মতো এখনও বিপ্লবী অবস্থা বিরাজ করছে, কাজেই সংগ্রাম করে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করতে হবে' (পৃ ১৭১)। পার্টির মধ্যে এই লাইন নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। যারা রণদিভের লাইনকে হঠকারী বলছে তারাই আন্দোলনকে পিছিয়ে দিতে চাইছে। আন্দোলন যখন পুরোদমে শুরু হয়েছে তখন পিছিয়ে আসা যায় না। পূর্ব পাকিস্তানে যখন লীগ সরকার সাম্প্রদায়িক বীজ ছড়াচ্ছে, তখন ঐক্যবদ্ধ মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে—আন্দোলন থেকে এই কথা বেরিয়ে এসেছে। হাজার-হাজার কৃষক নিজের অর্জিত শ্রমের ফসল তোলার জন্য কাস্তে হাতে মাঠে নেমে পড়ছে। জোতদার জমিদার একত্রিত হয়ে পুলিশকে খবর দিয়েছে। তারা এসে ধরপাকড় শুরু করেছে। পুলিশকে আন্দোলনকারীরা ঘিরে ফেলেছে, ধৃতদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে। দারোগা গুলি চালায়। কৃষক একজন মারা যায়—অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশকে পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলে। বিশাল পুলিশ গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিতে থাকে, কেউ যাতে পালাতে না পারে চারদিকে নিশ্ছিদ্র জাল পেতে রাখে, নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে, শাঁওতালপাড়া বিরান হয়ে যায়। বহুজনকে গ্রেপ্তার করে, ইলা মিত্রকে খুঁজতে থাকে। অবশেষে একদিন ইলা মিত্রকে পেয়েও যায়। তারপর চলে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অমানুষিক অকথ্য অত্যাচার। ইলা মিত্র হার মানেন না বরং তাঁর ওপর অত্যাচারের কাহিনী প্রচারিত হবার পর আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাসের মধ্যে নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত নীতিরও ছায়া দেখা যায়। কৃষক সংগঠনের প্রসঙ্গে রাজনীতি অনিবার্যভাবে এসেছে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সেটি প্রচারের পর্যায়ে নামে নি। জমির জন্য লড়াই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, ফসলের পাওনা নিয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে লেখিকা পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। উত্তেজনা বা চমক দিয়ে পাঠককে উত্তেজিত করেন নি—নিরুত্তেজ কণ্ঠে নিরাসক্ত দৃষ্টি—যাকে আর্টিস্টিক ডিট্যাচমেনট বলে—তাই দিয়ে তিনি সহজ-সরল ভাবে কাহিনী বলে গেছেন—মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দরুনই তা সম্ভবপর হয়েছে। জীবনের গভীর রস, জীবনের মর্মস্থলে যে গূঢ় রহস্য আছে, তার ওপর তিনি শুধু আলোকপাত করেন নি, তাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে দেখিয়েছেন যাদের নীচু করে রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব রয়েছে, তারা কারুর থেকে কম নয়। সেজন্য পার্টির আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস হয়েও রাজনীতি-নির্ভর রচনার এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে "কাঁটাতারে প্রজাপতি" গণ্য হবে। উপন্যাসে ইলা মিত্রের কাহিনী বর্ণিত হলেও তার চারপাশে কাহিনীর যে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে সেগুলি প্রধান কাণ্ডের সঙ্গেই সংযুক্ত। একাধিক চরিত্র আর কাহিনী উপন্যাসে আছে, কিন্তু লেখিকা অদ্ভুত মুন্সিয়ানায় সকলকে এক মোহনায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ছমিরআলি, আশিক আলি, কুতুব চরিত্র নির্মাণে স্বাভাবিকতা সৃষ্টিতে ভাষারীতিতে নাটকীয় আবেগ আরোপিত করে শিল্পসাফল্যে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন।

কোনো বিখ্যাত কিংবা অতিপরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ে উপন্যাস লিখলে স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়—এই কাহিনী কদ্দুর সত্যি? *Lust for Life*-এর লেখককেও এই প্রশ্ন বিচলিত করেছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উত্তরও দিয়েছেন, 'কিছু কল্পনা করে নিতে হয় কিন্তু সে কল্পনা ভ্যান গগের শিল্পীসত্তাকে ক্ষুণ্ণ না করে। এটুকু মেনে নিতে পারলে কাহিনীতে পরিপূর্ণ সত্যের অভাব নেই।' অনুরূপভাবে আলোচ্য উপন্যাস সম্পর্কেও বলা চলে—আজমল, ইয়াসিন বসনি, ছমির আলি, আসিক আলি, আছিয়া, হরমুন, শিবদাস, সুচন্দ, দিনমণি প্রভৃতি চরিত্র কাল্পনিক, সত্য শুধু রমেন মিত্র আর ইলা মিত্রের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন এবং তার পরিণামে পুলিশি অত্যাচার। সত্যকে শুধু ফুটিয়ে তোলার জন্য কল্পনার আশ্রয় মূল ঐতিহাসিক স্রোতকে মলিন করে নি।

সেলিনা হোসেনের গল্পরীতি রীতিমতো ঈর্ষাজনক—সহজ-সরল। ভাষায় গভীর ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা এবং দু-একটি আঁচড়ে একটি সম্পূর্ণ চরিত্র এঁকে দেওয়া তাঁর কাছে যেন কোনো ব্যাপারই নয়। তাঁর উপন্যাস পড়তে-পড়তে আমার মাঝে-মাঝে ইংরেজ লেখিকা জেন অসটেনের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর মতো তিনিও কী চরিত্রসৃষ্টিতে, কী ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য কথাশিল্পীর মতো বিস্তৃত বর্ণনার পরিবর্তে ড্রামাটিক প্রেজেনটেশনের নীতি গ্রহণ করেন। সমালোচক জর্জ হেনরি লিউইস জেনের রচনাভঙ্গি সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন সে কথাটি সেলিনা হোসেন সম্পর্কে বলতে ভালো লাগে—She presents the people and they reveal themselves। দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-বিহ্বলতার পরও আছে এক অমল প্রশান্তি, কারণ লেখিকার কাছে 'পুড়ে যায় গ্রাম এবং মানুষ, ঘাসফুলে তবু প্রজাপতি।' "কাঁটাতারে প্রজাপতি" ক্ষতবিক্ষত হলেও তবু সে প্রজাপতি থেকে যায়। পৃথিবীর সৌন্দর্য কখনও হারায় না, ম্লান হয় না। আমরা সবাই অমলকান্তি হয়ে যেতে চাই। নিরানন্দের মেঘলা আকাশে সেলিনা হোসেন আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন। মূর্তজা বশীরের আঁকা প্রচ্ছদ বইটিতে নতুন মাত্রা এনেছে।

দেহতত্ত্ববিষয়ক গান

রণেন্দ্রনাথ দেব

গ্রন্থটি বাঙলা দেহতত্ত্ববিষয়ক গানের আধুনিকতম সংকলন। এ সংকলনে স্থান পেয়েছেন—অনন্ত দাস, আর্জান শাহ, কমল দাস, কুবির গোসাঁই, গগন হরকরা, গোপাল দাস, গৌর গোসাঁই, চাঁদমুদীন, গোসাঁই গোপাল, জালালুদ্দীন, দীন শরৎ, দীনু, দুদ্দু শাহ, পদ্মলোচন, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ, বদিউজ্জামান, মদন শাহ, মিয়াজান ফকির, যাদুবিন্দু গোসাঁই, রশীদ, লালন শাহ, হাউড়ে গোসাঁই, হাসন রজা প্রভৃতি। এইসব গীতরচয়িতার অধিকাংশের নাম সুপরিচিত। একটি গ্রন্থে এঁদের ভালো-ভালো গানের সংকলন পাওয়ায় পাঠকেরা সুখী হবেন।

সংকলক একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন। গোড়াতে বলছেন—'দেহতত্ত্বের গান কেবল বাউলরাই লেখেন নি, বস্তুত বাংলা গানের একেবারে আদি উৎস চর্যাগীতি থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সহজিয়া বৈষ্ণবদের গান, যোগী-সম্প্রদায়ের গান, এমনকী রামপ্রসাদের শাক্ত গানে দেহসাধনার কথা স্পষ্ট রয়েছে। তবে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে দেহসংকেত পাওয়া যায় বাউল ও মারফতী গানে, কর্তভজাদের গানে, সাহেবধনীদের গানে, বলরামীদের গানে ও

বাংলা দেহতত্ত্বের গান—সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা-৯। জানুয়ারি ১৯৯০। পৃষ্ঠা ১১২+৫০+৬। বত্রিশ টাকা।

ফকিরি গানে। বর্তমান সংকলনগ্রন্থে জোর পড়েছে এই দ্বিতীয় ধরনের গানে। তার কারণ এইসব উপধর্ম-সম্প্রদায় কেবল যে দেহাত্মবাদী তাই নয়, তারা কায়াসাধনাতেও বিশ্বাসী। কায়াসাধনার অন্তে কিংবা সেই সাধনার সঠিক পথ নির্দেশের জন্যই এসব গানের জন্ম।'

দেহতত্ত্বগীতি সহজবোধ্য কারণেই সাংকেতিকতায় আবৃত। সম্পাদক সাংকেতিকতার আবরণটিকে সরিয়ে নিহিত অর্থ বোঝার পথ সুগম করে দিয়েছেন। একটু অংশ উদ্ধৃত করি :

'লৌকিক এইসব দেহাত্মবাদীরা বিশ্বাস করেন এমনতর ভাবনার ক্রমে যে, দেহের সবচেয়ে উপরি-ভাগে আছে চামড়া, চামড়ার মধ্যে রক্ত, রক্তের মধ্যে মাংস, মাংসের মধ্যে মেদ, মেদের মধ্যে অস্থি, অস্থির মধ্যে মজ্জা আর সেই মজ্জার মধ্যে শুক্র। শুক্রের মধ্যেই আছে প্রাণের বীজ। এই পর্যন্ত দেহের যে বস্তুগত ক্রম দেখা গেল, তারপরের ক্রমপর্ব কিছুটা ভাবাত্মক। সেই ক্রমটা এইরকম যে, শুক্রের মধ্যে আছে প্রাণবীজ, সেই প্রাণের মধ্যে আত্মারাম, আত্মারামের মধ্যে পুষ্প, পুষ্পের মধ্যে কলি, কলির মধ্যে চিৎশক্তি, চিৎশক্তির মধ্যে মন, মনের মধ্যে ভাব, ভাবের মধ্যে রস, রসের মধ্যে প্রেম, প্রেমের মধ্যে আছে সহজ বা আলেকসাঁই। তারই আরেক নাম মনুরায় বা মনের মানুষ। সুতরাং প্রেমই এইসব সাধক ও কবিদের প্রধান অন্বিষ্ট। কিন্তু সেই অন্বেষণের পথ জটিল ও কঠিন। কেননা প্রেমের পথ পদে-পদে কামে আচ্ছন্ন। সেই কাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেমের উপাসনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা দেহের সম্মোহ, অথচ দেহকেই পেরিয়ে (এড়িয়ে নয়) অস্থিষ্টকে পেতে হবে। তার জন্য চাই গুরুর উপদেশ-নির্দেশ, দম বা শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, দেহকে ঘিরে দেহকেই অতিক্রম করবার অর্জিত সূক্ষ্ম কৌশল।'

মাতৃকাশক্তির প্রভাব, ক্ষেত্র আর বীজের রূপক, আটকুটরি নয় দরজার তাৎপর্য, কোর্টকাচারি, বউবাজার, লালবাজার, আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট উক্তি ('দিনদুপুরে চাঁদের উদয়') প্রভৃতি বিষয়কে সম্পাদক সুস্পষ্ট বোধগম্য করে তুলেছেন।

সম্পাদক শ্রীসুধীর চক্রবর্তী সাহেবধনী সম্প্রদায় ও বলাহাড়ি সম্প্রদায় সম্বন্ধে গবেষণা করে খ্যাত-কীর্তি হয়েছেন। আলোচ্য সংকলনে প্রত্যাশিত যত্নের ছাপ আছে। তবে, গ্রন্থের শেষভাগে যে ছয়-পৃষ্ঠাব্যাপী অর্থসংকেত দেওয়া হয়েছে তা বিস্তৃততর হলে সাধারণ পাঠকের উপকার হত। অনেকগুলি পদ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

সম্পাদকের মন্তব্য সমীচীন যে দেহতত্ত্বের গান যাঁরা লিখেছেন 'উচ্চবর্গের ধর্মসম্প্রদায়ের মত তাঁরা শাস্ত্র বা মন্ত্র না লিখে গান লিখেছেন'। 'উচ্চবর্ণের দেববেদী-পূজার সমান্তরালে দেহ-চেতনাবহুল এই গুহ্যসাধনার বিশিষ্টতা গড়ে উঠেছিল' যাকে গীতিকাররা লৌকিক জীবন থেকে আহৃত উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ব্যক্ত করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার একবার পূর্ববঙ্গে স্টিমার-ভ্রমণকালে একটি গায়কের মুখে কিছু গান শুনে তা লিখে রাখেন। পরে তা "প্রবাসী" পত্রিকায় (মাঘ ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) ছাপান। এখন তা দুষ্প্রাপ্য বলে চারটি গান উদ্ধৃত করছি—

১। তুমি আমায় ছাইড়্যা যাইও না।
তুমি আমি ওক্ত হইলে তবে কি আছে ভাবনা।
শিক্ষাগুরু গোলোকপতি, দীক্ষাগুরু হইবে সাথী
জ্বালাইয়া গিয়ানের বাতি দিবে উপোসোনা।
(ঐক্য=ওক্ত। উপাসনা=উপোসোনা)

২। তোরে বলি ওরে অবুঝ মন—
আল্লানবীর নাম তুমি নাওরে অখন।
এক বিনে জগৎ অন্ধকার
আর এক বিনে বন্ধু ভবে নাই এ সংসার।
ওরে মূলেতে মূল ঠিকা রাখিও
মাজনকেরে না দিও ফাঁকি
ভাবিয়া দেখোরে মন আর কি তোর আছে বা বাকি।

৩। আগুন পানি হাওয়া মাটি
যখনি না ছিল,
কি দিয়া দমেরি জাহাজ
তইয়ার করিল ?
দমেরি জাহাজ বানাইয়া
কি কল কাটাইছে,
দুই বারা দুই বাঁকা যেমন
হামেশে ঘুইরতেছে।
বাঁকাতে নাই গো বাঁকা
আসমানে জমীনে ঠেকা
তারে কেও চিনে না।
(বারা=পার্শ্ব, বাঁকা=সুন্দর)

৪। হরি বললি না মন আমার
একদিন ভবে দেখবি অন্ধকার।
ভবে কয়বার এলি কয়বার গেলি
ভবে আসা যাওয়া হল সার।
কোথায় রবে এঘর বাড়ি
কোথায় রবে সুন্দরী নারী
কোথায় রবে যৈবনের বাহার।
যেদিন দেহ ছেড়ে প্রাণ পালাবে
সেদিন বলবে না কেউ তালুকদার।
কোথা রবে জামাজোড়া
কোথা রবে নীলা ঘোড়া
কোথা রবে পালকির সওয়ার।
যেদিন শমন এসে করবে বন্ধন
সেদিন পড়ে রবে এ সংসার।
ভবে এসে এই কবিলি
রঙ্গে বসে কাল কাটালি
দালান কোঠা কতই দিলি দেখতে চমৎকার।
যেদিন ভবের খেলা সাঙ্গ হবে
সেদিন দেখবি রে ঘোর অন্ধকার।

পূর্ববঙ্গে যেসব কায়াসাধনা-সম্প্রদায় ছিল তাদের গান সম্ভবত সংকলনকর্তা জোগাড় করতে পারেন নি। ওগুলো পেলে এ সংকলন পূর্ণতর হত।

এই প্রশংসনীয় সংকলনটিতে দুয়েকটি ছোটো-খাটো বিচ্যুতি নজরে এল। ভূমিকার ১৭ পৃষ্ঠায় রবার্ট ব্রিফল্টের উল্লেখ আছে। ব্রিফল্ট্ হবে কি ? ব্রিফলটের কোন্ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ? একজন গীতরচয়িতার নাম দেওয়া হয়েছে হাসান রাজা। হবে হাসন রজা।

ইংরাজি ভাষায় লেখা ভারতীয় কবিদের রচনা

শ্যামশ্রী লাল

অধ্যাপক ক্রস কিং-এর গবেষণামূলক বইটি যে 'চতুরঙ্গে'র পাতায় সমালোচনা করা যেতে পারে, তা কয়েক বছর আগেও হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারতাম না। যে হতভাগ্য দেশের নানা ভাষাগত 'গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্ববী বসুধারে রাখিয়াছে খণ্ড ক্ষুদ্র করি' (দু-একটি শব্দ বদলেছি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করি), সেই দেশে ইংরেজি ভাষায় লেখা ভারতীয় কবিদের রচনা যে ভারতীয় পাঠকমণ্ডলী তখন প্রত্যাখ্যান করবেন—পুস্তক-সমালোচনা লেখা তো দূরের কথা—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তা ছাড়া প্রত্যাখ্যানেই তো এক প্রকার সমালোচনা লুকিয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে পরে আবার আসব।

আমাদের দেশের ইংরাজি পত্রপত্রিকায় অধ্যাপক কিং-এর বইটি আলোচিত হয়েছে দেখেছি। বেশির ভাগ লেখা, আমরা পশ্চিম পৃথিবীর গবেষকদের বিষয়ে যেমন সম্ভ্রম আর সাবধানতা প্রকাশ করি, সেই শৈলীই অবলম্বন করেছে। কয়েকটি লেখা কিন্তু স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে, যেমন The Sunday Observer-এ ড. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত সমালোচনা, সাহিত্য একাদেমীর Indian

Modern Indian Poetry in English—by Bruce King. Oxford University Press, Bombay / Calcutta / Madras. Rs. 150.

Literature পত্রিকায় ড. এম. কে. নায়কের সূক্ষ্ম, প্রাজ্ঞ বিচার, The Book Review পত্রিকায় জি. ভি প্রসাদের আশ্চর্য সরস ও তীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলি আর কর্ণাটক-গুলবার্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগীয় সাহিত্য-পত্রিকায় ড. আনন্দ লালের সুবিন্যস্ত মীমাংসাপদ্ধতি।

বিদেশী গবেষকদের উৎসাহের আতিশয্য থাকলেও ভারতীয় বিষয়ের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা অনেক সময়ে তাঁদের সীমিত হওয়ায়, গবেষণাকর্ম নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। আমার অভিজ্ঞতায়, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. লেনার্ড গর্‌ডন্ (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম বিষয়ক গবেষণা), মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ডেভিড্ কক্ (ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতীয় নবজাগরণ সম্পর্কিত গবেষণা), হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ডায়না এক (প্রাচীন নগরী কাশী ও তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিষয়ক অনুসন্ধানী কাজ) এবং সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ নাম, অধ্যাপক ডেভিড ম্যোকাচ্চণ, (যিনি বিশ্বভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, এবং বঙ্গসংস্কৃতি ও ভারতীয় ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে গভীর গবেষণায় লিপ্ত থাকার কালে কলকাতাতেই হঠাৎ মারা যান)—বিদেশী গবেষকদের মধ্যে এঁরাই কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, যাঁরা ভারতীয় পরিবেশ ও মানসিকতার অনেকটা ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছেন এবং তার ফলস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম আমাদের দান করেছেন।

ভারতীয়-ইংরাজি সাহিত্য বিষয়ে জানতে হলে আমাদের ঘরের কাছেই তো রয়েছেন অধ্যাপক কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গর, যাঁর গভীর গবেষণালব্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ *Indian Writing in English*, ভারতীয় সাহিত্যের এই অংশটির বিস্তৃত ইতিহাস ও মূল্যায়ন চিত্রিত করেছে। কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এম. কে. নায়কও আরেকজন বিশ্বাসযোগ্য গবেষক এই সাহিত্যগোষ্ঠীর।

ব্রুস কিং সাহেবের গ্রন্থটির বিশেষত্ব হল, তিনি ভারতীয়-ইংরাজি সাহিত্যের কাব্যাংশতেই তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, তিনি নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধুমাত্র 'আধুনিক' ভারতীয় ইংরাজি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করে গেছেন। ভারত স্বাধীন হবার পরে যেসব ভারতীয় কবি ইংরাজিতে কবিতা লিখে যাচ্ছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই কিং সাহেবের বিষয়বস্তু। বইয়ের ভূমিকায় তিনি বেশ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন যে আধুনিক ভারতীয়-ইংরাজি বিষয়ে তাঁর বইটিই প্রথম বিস্তারিত গবেষণাগ্রন্থ এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক মূল্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে। পরের লাইনেই তিনি দুঃখ করছেন সে সব বইয়েই খানিকটা আপোস-রফা করতে হয়, তাঁকেও তাই কয়েকটি তরুণ কবিকে আলোচনা থেকে বাদ দিতে হয়েছে।

কিন্তু আমাদের মতন সাধারণ পাঠক বইটি পড়তে শুরু করতে-করতেই সমস্যায় পড়বেন। তেরোটি পরিচ্ছেদে সাজানো বইটি আসলে শুধুই বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য কবি নিসিম্ ইজিকিয়েল ও তাঁর দলীয় একটি কবিগোষ্ঠীর গুণকীর্তনে গাঁথা উচ্ছ্বসিত কাহিনী। ব্রুস কিং যদি প্রথমেই মলাটের নামে লিখতেন 'কবি নিসিম্ ইজিকিয়েল ও তাঁর কবিগোষ্ঠী', তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। এমন বই তো কত লেখা হয়েছে—প্রায় দুইশত বছরের এই সাহিত্যের ইতিহাস থেকে একটা বাছাই-করা অংশ নিয়ে গবেষণা করা তো যুক্তিগ্রাহ্য। তা ছাড়া বিভ্রান্তিকর বইয়ের মলাটে বোম্বাই গোষ্ঠীর ওই কটি বাছাই-করা নাম, ঠিক নামাবলীর নামগানের মতন বারবার ফিরে-ফিরে চলেছে। লেখক এক জায়গায় (পৃ ২৫২) বলছেন যে তিনি শুধু নব্য ভারতীয় ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের বর্ণনা করতে চান, দোষগুণ বিচার করার উদ্দেশ্য তাঁর নেই। অথচ, তাঁর ইতিহাস-দর্শন, আধুনিক-বোম্বাইয়ের কবিদের পাশ কাটিয়ে মাঝে-মাঝেই এদিকে ওদিকে ঘুরেছে, অন্যান্য 'অগ্রাহ্য' কবিমণ্ডলীর দোষত্রুটি খুঁটিয়ে দেখাতে। এই অভ্যাসটির চরম উদাহরণ হল ৫৫ পৃষ্ঠায়, যখন লেখক আশ্চর্য হচ্ছেন ভেবে যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুবই কম-সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ইংরাজি সাহিত্য পঠন-পাঠন করা হয়—আর যদি বা হয় তো, 'Aurobindo, Taru Dutt, Sarojini Naidu and *even Tagore* are often the main poets studied.' আবার ২৩৪ পৃষ্ঠায় আরেকটি চমৎকারী উক্তি—Oxford University Press-এর এক কর্তাব্যক্তি, কবি পার্থসারথি; তাঁর গুণগান করতে গিয়ে কিং বলছেন যে, ইংরাজি লেখা থেকে সরে গিয়ে মাতৃভাষা তামিলের দিকে ফিরে গেলেন পার্থসারথি—তখন তিনি had 'shown his interest in such an *otherwise insignificant* 19th century writer as Madhusudan Dutt'.

এই ধরনের হীরা-জহরত পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে দেওয়া আছে কিং সাহেবের বইতে। পড়তে-পড়তে হাসি, রাগ আর দুঃখ একটু সঙ্গে অনুভব করা যায়। আসলে, বেচারী অধ্যাপক এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা ভাষা নানা মতাবলম্বী মানুষদের মধ্যে আসল কবিদের খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে গেছিলেন, বোধহয়। শেষকালে বোম্বাই শহরের অনুকূল পরিবেশে পৌঁছে, মার্কিন-সাহিত্যসেবী কয়েকটি 'শহুরে' কবিদের সঙ্গে মনের মিল খুঁজে পেলেন। মনে হয়, তার আগে তিনি, যতটা চিবোতে পারতেন তার চেয়ে অনেক বেশি বড় টুকরোয় কামড় বসিয়ে ফেলেছিলেন। ভারতের অন্যান্য শহরে তিনি গেছেন, নোটবুক ভরতি করে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন, 'আধুনিক' ভারতীয় ইংরাজি কবিতার গবেষক হয়েও, কাশীপ্রসাদ ঘোষ অথবা শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি কবিদের সম্পর্কে, তাঁর প্রিয় বোম্বাই-কবিদের মুখে শোনা অসার ও অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যগুলি বেদবাক্য ভেবে তুলে ধরেছেন (যেমন 'Indian verse in English did not seriously begin to exist until after withdrawal of the British from India'—পার্থসারথি। অথবা 'Anyone who thinks highly of Sri Aurobindo as a poet has no feeling for the English language'—নিসিম্ ইজিকিয়েল্।)—তারপরে এলোমেলো নানা তথ্য, অনেকগুলি অবান্তর, একান্তই ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি ঘটনা, যা গালগল্পের পর্যায়ে ধরা যেতে পারে, সব জড়ো করে কিং সাহেব খেই হারিয়ে ফেলেছেন—ফলে অনেক কিছুই জট পাকিয়ে গেছে। কোনো কবির স্ত্রী আরেক কবিপত্নীর বন্ধু ছিলেন, অথবা এক অফিসে কাজ করতেন, কার বাবা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করতেন, কোন্ কবি পার্শী, অথচ হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেছেন—কাব্যের সাহিত্যরূপ বর্ণনায় এসব কিভাবে প্রাসঙ্গিক? বইয়ের শেষে তিন-চারটি পরিশিষ্ট অংশ জুড়ে এইরকম নানা ফর্দ সাজানো আছে—যা পড়তে মজা লাগে, অনেক খবর পাওয়াও যায়, স্বীকার করতেই হবে। কোন্ কবি কত পুরস্কার পেয়েছেন, কোন্ কাব্যসংকলনে কোন্ কবি ঢুকতে পেলেন, কার পিতা-মাতা কতদূর শিক্ষিত, কোন্ ধর্মে তিনি বিশ্বাসী, ইত্যাদি তথ্য ফর্দেও আছে, আবার বইয়ের প্রধান অংশেও পুনরুক্ত হয়েছে। এসব লিখতে-লিখতে মারাত্মক ভুল করেও ফেলেন ব্রুস কিং। লক্ষ্মী কান্নন ওড়িয্যার কবি, প্রীতীশ নন্দী হিন্দু পানজাবি, কোনও নির্ভরযোগ্য গবেষক লিখতে পারেন না। ভারতীয় ইংরাজি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি প্রাধান্য দিচ্ছেন ইজিকিয়েলের L.S.D. ড্রাগের নেশার অভ্যাসকে (১৯৬৭ থেকে ৭২-এ ২৪ বার)। বিক্রম শেঠের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁর সমকামিতাও আলোচিত।

কিং সাহেবের মতে, সাহিত্যের অধ্যাপকদের মতামত বা প্রবন্ধে লিখিত একাডেমিক সমালোচনার

চেয়ে কোনো নামী কবির কাছ থেকে প্রশস্তিপাত্র পাওয়াই ভারতীয় কাব্যসমাজে উচ্চ আসন গুছিয়ে নেওয়ার প্রকৃষ্ট পথ। এটা বেশ চিন্তা করার মতো কথা। ২১০ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন 'We can ignore critics।' তার আগে-পরে তো চলেছেই অধ্যাপকের বোম্বাই-কাব্য-কীর্তন।

নানা ফর্দ ঘাঁটাঘাঁটির পরে অধ্যাপক সাহেব একটা হিসেব লিখে ফেললেন। 'আধুনিক' ভারতীয় ইংরাজি কবিদের মোটামুটি তিন-চারটে দলে ভাগ করে দিলেন—বোম্বাই ঘরানা অবশ্যই প্রথম, তাছাড়া দিল্লী-এলাহাবাদ ঘরানা, ওড়িয়া শাখা যা বোম্বাইয়ে ধাবমান, এবং সবচেয়ে নিন্দনীয় ঘরানা—কলকাতা! ভারতীয় সাহিত্যের নবীনতম শাখারও যদি এই কয় বছরের ভিতরেই এমনই দুর্দ্দশা হয়ে থাকে, তাহলে দেশে রাজনৈতিক ভাঙাভাঙি নিয়ে আর ভাবনাচিন্তা করি কেন?

আরো ভয়ংকর সিদ্ধান্ত অধ্যাপকের হল ভারতীয় ইঙরাজি কবিতার প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে। সহজ বাংলায় তা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় যে, এই কবি-গোষ্ঠী (অর্থাৎ যাঁরা আসল কবি)। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি ও সমাজ থেকে তফাতে দাঁড়ানো একটি দল, যাঁরা হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের বাইরে, এবং যাঁরা পার্শী, ইহুদী ও খ্রীষ্টান; তাছাড়া ইংরাজি শিক্ষাপদ্ধতি তাঁদের বিচ্ছিন্নতার সহায় ও পশ্চিমদেশমুখী হবার কারণ এমন দায়িত্বহীন অপবাদ যে কোনো স্থিরবুদ্ধি গবেষক উচ্চারণ করতে পারেন—তাও আবার প্রশংসার সুরে—তা কখনো ভাবতেও পারি নি। কিন্তু একটা উপকার করলেন কিং সাহেব—তিনি ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে ইসলামকেও স্থান দিলেন, ভাগ্যবশত!

এরপরে অন্ধ পক্ষপাতদুষ্ট বইটি নিয়ে আর কত লেখা যায়? ইজিকিয়েল্ সাহেব অধ্যাপকের এই ঐতিহাসিক-নাটকের মহানায়ক। *Quest* পত্রিকার পত্তন ও গঠনেও নাকি তিনিই প্রধান। আইয়ুব তাহলে কোথায় ছিলেন? ড. মুখোপাধ্যায় হালকা ঠাট্টায় ওঁকে যুধিষ্ঠির নাম দিয়েছেন, তাঁর সমালোচনাতে। কিং সাহেবের কুরুক্ষেত্রে যদি ইজিকিয়েল হন যুধিষ্ঠির, তবে দুর্যোধন আর কে অধ্যাপক পুরুষোত্তম লাল ছাড়া—যিনি 'ভারতীয়তা' নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেন? তবে তাঁর উপরে যেমন অঝোরে অস্ত্র বর্ষিত হয়েছে, এবং তাঁকে কোণঠাসা করে সকলের আক্রোশ চাপানো হয়েছে—তাতে অভিমন্যুর কথাও মনে পড়তে পারে! আচ্ছা, না হয় সব নষ্টের মূলই হলেন শ্রী পি. লাল ও তাঁর Writers Workshop। প্রীতীশ নন্দী ডম্ মোরেইস্, মোকাশী পুণেকর, মণিকা ভর্মা, গৌরী দেশপাণ্ডে, কেশব মালিক, রুক্ষ পুরী, এঁদের কী হল? কুরুক্ষেত্রে কত মাথাই না কাটা গেল। যুধিষ্ঠির কিন্তু শুনেছি, স্বর্গে গিয়ে দেখলেন দুর্যোধন তাঁর আগেই পৌঁছেছেন সেই সভায়। কিং-সাহেব তখন কি আরেকটি বই লিখবেন?

লেখার আরম্ভের প্রসঙ্গ তুলে এবার শেষ করি। "কলকাতা ঘরানা"ও এবার জেগে উঠছে, তাই উচ্চ-মানের বাংলা-সাহিত্য পত্রিকাতেও 'ভারতীয়'-ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি দুয়েকটি বাঙালি লেখক ইংরাজিতে লিখে নাকি জগৎসভায় সাড়া জাগিয়েছেন (এর আগে কি কোনও বাঙালি কবি বা লেখক পশ্চিম জগতে প্রশংসা পান নি?) তাই বাঙালির গর্ব উচ্ছ্বসিত আজ। 'ভারতীয়' ইংরাজি সাহিত্য বলতে তাহলে বাকি রইল কি?

নারীনির্যাতন : শেকড়ের সন্ধানে

আহমদ শরীফ

আজকাল শহুরে শিক্ষিত লোকেরা নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও প্রচারণায় উচ্চকণ্ঠ। যাঁর যেমন যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-রুচি-ন্যায়বোধ, তিনি তেমন সব করুণ আর জোরালো কথায় বাকজাল বিস্তার করেন। কিন্তু এ নির্যাতনের গোড়ায় যে শাস্ত্রিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক নীতি-নিয়মের এবং রীতি-রেওয়াজের সমর্থন রয়েছে, এতে যে পুরুষের শাস্ত্রিক ও নৈতিক, জন্মগত ও প্রাজন্মক্রমিক অধিকার রয়েছে, তা তাঁরা বিবেচনা করেন না।

চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে প্রথমে রোগের লক্ষণ নিরূপণ করতে হয়, পরে তার কারণ নির্ণয় করতে হয় এবং পরে তার প্রতিকারের বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হয়। নারীনির্যাতনের কারণগুলো আগে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে নিরূপণ করতে হবে, তারপরে প্রতিকারপন্থা আবিষ্কার তেমন কঠিন না-ও হতে পারে। কিন্তু উপায় সর্বদা-সর্বত্র প্রয়োগসাধ্য করার জন্যে আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক অবস্থা ও অবস্থান বাঞ্ছিত মানে, মাপে এবং মাত্রায় উন্নীত ও বিকশিত করতে হবে।

১. বিয়ে-প্রথা চালু করতে হয়েছে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি নিবারণের জন্যেই, এ আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ আদিকাল থেকেই প্রাণী হিসেবে পুরুষের 'জরু'-র প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ নরের নারীসম্ভোগলিপ্সা যেমন বিশেষ বয়সে সার্বক্ষণিক, গোড়ার দিককার অবিকশিত চেতনার নারীর মধ্যে তা উন্মেষিত হয় নি হয়তো,—কারণ প্রাণিজগতে প্রায়ই নারীর কামবাঞ্ছা কেবল সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার জন্যেই অপ্রতিরোধ্যভাবে জাগে—তার তীব্রতা তাকে যেন যন্ত্রণাগ্রস্ত করে তোলে, রতি-সম্ভোগেই তার এ যন্ত্রণা মুহূর্তে ঘোচে—সে হয় যথাসময়ে সন্তানবতী। মনুষ্যপ্রজাতি সম্ভবত ক্রমাগত মানসোৎকর্ষের ফলে নারীর মধ্যেও কামবাঞ্ছা কৃত্রিম উপায়ে জাগিয়ে রতি-রমণ আনন্দ উপভোগ করে। দৈহিক অবয়বে প্রবল এবং মানসিকভাবে সদা-প্রস্তুত নরজাতীয় প্রাণীরই ভূমিকা রতি-রমণক্ষেত্রে সক্রিয়, নারীজাতীয় প্রাণী বাহ্যত নিষ্ক্রিয়, এর থেকেই প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা হয়েছিল যে পুরুষই সম্ভোক্তা এবং নারী সম্ভোগ্য মাত্র। এ ধারণা এ যুগেও প্রবল।

২. যখন আদিতে নারী ছিল যে-কোনো পুরুষের ভোগ্য, তখন সন্তানলালনের দায়িত্ব ছিল কেবল মায়েরই। এবং সন্তান চিহ্নিত হত মায়ের নামেই। এ মাতৃকেন্দ্রিক যৌথজীবনেও যখন দ্রৌপদী-বিয়ে চালু হল, অর্থাৎ এক নারীকে হিমালয় উপত্যকার কিন্নরদের মতো সবভাইয়ের স্ত্রী করে উপভোগপ্রথা চালু হল, তখন সে-নারী হল মক্ষিরানীর মতো। এ যৌথসম্পদ নারী ও সন্তানগুলো কারো একার ছিল না বলে, তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ছিল না বলেও ওই নারী ছিল স্বাধীন। আবার সব বোনের এক-স্বামী-প্রথাও ছিল চালু। ভুটান রাজার ক্ষেত্রে এখনো তা চালু রয়েছে। উনিশ শতক অবধি হিন্দুদের মধ্যে এমনি ব্যবস্থার কচিৎ প্রচলন ছিল।

৩. আরো পরে যখন কাড়াকাড়ি ও হানাহানি মুক্ত নিরুপদ্রব সমাজ কাম্য হল, তখন বিয়ে-প্রথা

চালু হল পুরুষের স্বার্থে নিরুপদ্রব-নিরুদ্বন্দ্ব সম্ভোগ লক্ষ্যে। তখন এক পুরুষ বাহুবল ও খাদ্যসংগ্রহশক্তি অনুসারে বহুপত্নীক হতে থাকল। তখন নারী হল পুরুষের সম্ভোগপাত্রী। তার স্বাধীনসত্তা হল অস্বীকৃত। এখন থেকে নারীদেহের অধিকারী এবং তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অভিভাবক, নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক হল পুরুষ। নারীর ভোগ্যপণ্যসত্তার ও বাঁদীসত্তার শুরু এভাবেই।

৪. পুরুষের চিত্তবিনোদন- ও রতিরমণ-পাত্রী হওয়াই যখন নারীর একমাত্র সামাজিক উপযোগ বলে বিবেচিত হল, তখনই সভ্য সমাজে দুনিয়ার সুন্দরীতম নারীর সন্ধান এবং তাকে বাহুবলে ছিনিয়ে আনাই হল বীরত্ব, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব, পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বড়ো কৃতি ও কীর্তি বলে হল বিবেচিত। একারণেই নারী হল বীরভোগ্যা। এবং বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, সংকল্পের সঙ্গে উদ্যোগের সমন্বয়ে জনবল-ধনবলকে পুঁজি ও পাথেয় করে রাজপুত্তুর পাড়ি দিত অজ্ঞাত-অকূল সমুদ্রে। সব আদি রূপকথার ও মহাকাব্যের বিষয় এ-ই। সভ্যতার বিকাশের ধারায় প্রথমে এ 'জরু' নিয়েই শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, জঙ্গ-যুদ্ধ-লড়াই। তারপর যাযাবর জীবনের অবসানে 'জমি' নিয়ে এবং পরে সম্পদ- প্রতীক 'জরু' নিয়ে, নারী-ভূমি-স্বর্ণ নিয়ে চলতে থাকে চিরন্তন লড়াই। এখন যা মুদ্রা-প্রতীক সম্পদে স্থিতি পেয়েছে—ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সম্পদের 'চেক' হাতে থাকলেই নিশ্চিত ভোগ-উপভোগের জীবন। আগে কেবল জরু ও জমি ছিল বীরভোগ্য। কেননা তা মনোবল, বাহুবল, জনবল ও ধনবল প্রয়োগে কাড়তে, অর্জন বা অধিকার করতে হত। এখন ছল-চাতুরী-প্রতারণা প্রয়োগেই সম্পদ অর্জন বা সংগ্রহ-সঞ্চয় করতে হয়। তাই একালে অর্থ-সম্পদই হচ্ছে একালের বীরত্বের ও বড়োত্বের পরিমাপক।

৫. নারীকে যখন মূল্যবান ভোগ্যবস্তুর মতো করে ভাবল মানুষ, তখন থেকেই তার মনে রিরংসাপ্রসূত ঈর্ষা-অসূয়া-অসহিষ্ণুতা জন্ম নিল। এ ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি অন্যের লোলুপদৃষ্টি, ভোগেচ্ছা, মানস-দুর্বলতা সে সহ্য করতে অপারগ হল; তখন থেকেই নারী হল সযত্ন সতর্ক প্রহরার পাত্রী, গৃহকোণ হল তার নির্বিঘ্ন আশ্রয়, নারীর পরদা আর সতীত্ব এভাবেই পেল গুরুত্ব। নারীর "সতীত্বে"-র গুরুত্ব পুরুষের রিরংসাজাত অসূয়ায় ও অসহিষ্ণুতায়। ভীতা নারীর মধ্যে প্রাক্তনক্রমিক বিশ্বাসে ভয়ে এ সতীত্ববোধ তার দেহের রক্ত-মাংসের মতোই অবিচ্ছেদ্য সংস্কারে পরিণতি পেয়েছে। আজো পুরুষ-স্পৃষ্টা বলেই বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজে ঘৃণ্য। এবং এক সময় বিধবাকে এককব্যক্তিভোগ্য বলেই পুড়িয়ে মারা হত।

৬. শৈশব-বাল্য-বিবাহের উদ্ভব ওই "সতী" রাখার গরজেই। আট-নয়-বারো বছরে নারীর বিবাহ দিতেই হত। নইলে সমাজে নিন্দিত ও পতিত এবং অভিভাবকের নরকে স্থিতির আশঙ্কা থাকত।

৭. এ শৈশব-বাল্যবিবাহ থেকেই শ্বশুর-শাশুড়ির ও স্বামী-ভাসুরের অভিভাবকত্বের, কর্তৃত্বের তথা শাসনের নিয়ন্ত্রণের, হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর, পিটানোর, বেঁধে রাখার, অনাহারে রাখার অধিকার প্রয়োজনীয় বা জরুরি হয়েছিল। এভাবেই স্বামী হল নারীর মর্তজীবনের ঈশ্বর, ভগবান, মালিক, পূজ্য, তার পায়ের তলায় তার স্থান তথা স্বামীর কাছে আত্মা ও আত্মসমর্পণ করেই, সত্তার স্বাতন্ত্র্য বর্জন করেই, দেহ-মন-চেতনা স্বামীর অনুগত করেই নারীজীবন সার্থক ও ধন্য করতে হয়। দুনিয়ার সব ভাষাতেই স্বামী-বাচক শব্দগুলো প্রভুত্বজ্ঞাপক। পত্নীমাত্রই সেবিকা। এজন্যে দুনিয়ার সব ধর্মশাস্ত্রে নারীর স্থান পুরুষের নীচে। নারীর অভিভাবকত্ব পুরুষের তথা পিতার, স্বামীর ও সন্তানের অধিকারে। নারী হচ্ছে পিতা- স্বামী ও সন্তান-পাল্য ও পোষ্য অবলা-অকেজো প্রাণী, যদিও উৎপাদন-নির্মাণনির্ভর

সমাজে নারী গোড়া থেকেই শ্রম দিচ্ছে,—ব্যতিক্রম কেবল শাহ-সামন্ত-সদাগর-শাসকঘরেই লভ্য।

৮. এ শাস্ত্রিক ব্যবস্থা নারীকে আজো হীনম্মন্যতায় ভোগাচ্ছে। মুসলিমঘরের চাকুরে নারী আজো 'কাবিন' নিয়ে সম্ভোগ্য প্রাণী হিসেবে বিক্রীত হতে আগ্রহী। আজো স্বামীর "পদবী" স্বনামে যোগ করে ইন্দিরা-ম্যারগ্যারেট ধন্যা। আত্মসত্তায় ও স্বাতন্ত্র্যে স্থিত থাকা নয়—আত্মসমর্পণেই—সেবিকা-ভাবেই তার সুখ। এ আধি থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে সচেতন প্রয়াসে।

৯. মনস্তাত্ত্বিকভাবে এ মুহূর্তেও নারী কিছুতেই নিজেকে স্বাধীন সত্তায় পুরুষের (দৈহিক শক্তি ব্যতীত) সর্বপ্রকারে সমকক্ষ বা সমান বলে ভাবতেই পারে না। যদিও সভায় উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করে। পুরুষও উত্তম্মন্যতায় ভোগে। আজ অবধি সমাজের ও সমাজ-মানসের রূপ এমনই।

১০. আদিতে যখন লেখাপড়ার কোনো আর্থিক মূল্য ছিল না, তখন সেই নিরক্ষর সমাজে কন্যাপণই ছিল। এখনো অনেক দেশে বহু দামে কনে কেনা হয়। বড়ো ঘরে মানী পরিবারে বিয়ে করাতে হলে চিরকালই টাকা দরকার হত। বামুনের মেয়েকে তো দিয়েথুয়ে সম্প্রদান করাই ছিল আবহমান কালের প্রথা। এ-ও উল্লেখ্য যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই কোনো কোনো অঞ্চলে—সম্ভবত আবহাওয়ার দরুন বা অন্য কোনো জৈব কারণে—পুরুষের চেয়ের নারীর সংখ্যা কম থাকত বা থাকে, সেখানে নারীর বাজারদর বেশি। কোথাও-কোথাও নারী বেশি, পুরুষ ছিল কম, সেখানে আবার পুরুষের বহুবিবাহ ছিল সহজ এবং সামাজিকভাবে জরুরি। এ ভাবেই এক-নারী-বহু-স্বামী, এবং এক-স্বামী-বহুপত্নী প্রথা চালু হয়েছিল। এ ছিল অনেকটা চাহিদা-সরবরাহের আনুপাতিক হার নির্ভর।

১১. একালের যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তিনিয়ন্ত্রিত জগতে আদিম কৃষি ও বাণিজ্য নির্ভরতার বিবিধ বিকাশের ফলে মানুষের ধন-মান-পদ-পদবী-খ্যাতি-ক্ষমতা বহু ও বিচিত্র ভাবে সামাজিক মানুষের মান-মর্যাদা-অর্থ-বিত্ত অর্জনের পথ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কারণে ভালো ও বড়ো চাকুরে, বৃহৎ-শিল্পের মালিক বা প্রকৌশলী-বিদ্বান-চিকিৎসক, ক্ষমতাবান ও উচ্চপদস্থ আমলা-উকিল-সাংসদ প্রভৃতির সঙ্গে কুটুম্বিতা তথা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী হয়েছে মানুষ। তারাই বর বা জামাই কেনে বহু অর্থ-সম্পদ দিয়ে। প্রলুব্ধ বর ও তার অভিভাবক দরকষাকষি করে, চড়া পণ হাঁকে—সম্বন্ধলিপ্সু কনেপক্ষ "যৌতুক" নামে উঁচুদরে দাম দিয়ে 'জামাই' ধরে।

১২. শিক্ষিত শহুরে সমাজে দরিদ্র এবং মনের দিক দিয়েও কাঙাল পুরুষেরা যৌতুক নিয়ে সচ্ছল হতে চায়। দরিদ্র ঘরের মাঝারি ও রূপহীনা কন্যারা যৌতুক যোগাড় করতে পারে না বলে অনূঢ়া থাকে—এখন প্রায় তা রীতি-রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

১৩. কিন্তু গাঁয়ের অনক্ষর চাষি-মজুর-গৃহস্থ ঘরে অন্ত্যজ সমাজে আজো কন্যা অনূঢ়া রাখা চলে না, নিন্দিত পতিত ও শাস্ত্রিকভাবে মহাপাপী হতে হয়। আজো অন্তর্জলি মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গেও বিয়ে দিয়ে নিন্দা-পাপমুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই নিঃস্ব-দরিদ্র অভিভাবক সাধ্যাতীত অর্থের যৌতুক দেবার অঙ্গীকার করে কন্যার 'অনূঢ়া' নাম ঘুচিয়ে নিন্দা- ও পাপ-মুক্ত হয়। পরে যৌতুক যোগাড় করতে পারে না বলে শ্বশুরবাড়িতে কন্যা নির্যাতিত ও নিহত হয়। বধূর অক্ষম মা-বাপের অঙ্গীকার ভাঙার, কথার খেলাপের দায়ে প্রাণ হারায় তরুণী বধূ। এসব বধূ শিক্ষিতা হলে তথা রোজগারে সমর্থ হলে সামাজিক-ভাবে বাইরে কাজ করার অধিকার পেলে, শিক্ষিতা মহিলাদের মতোই অনূঢ়া থাকার সামাজিক অধিকার পেত এবং চাকুরে হিসেবে টাকার গাছরূপে শ্বশুরঘরে নিরুপদ্রব জীবনযাপন সম্ভব হত। কাজেই গাঁয়ে গঞ্জে

শহরে বন্দরে নারীমাত্রই রোজগেরে হলে যৌতুক দেয়া-নেয়া বন্ধ করা বা হওয়া যেমন সহজ হবে, তেমনি নিপীড়ন-নির্যাতনেরও কোনো আর্থিক কারণ থাকবে না। অবশ্য দাম্পত্যে মানসিক অসুখের ও অস্বস্তির অন্য কারণ কারো-কারো জীবনে থাকবেই। এবং এ যুগে তালাক মাধ্যমে সেসব দুঃখমুক্তির উপায়ও রয়েছে।

১৪. আগে হাটে-বাজারে বেশ্যালয় ছিল, তখন পাড়ায় গৃহস্থের মেয়েরা থাকত হামলামুক্ত। সমাজটা হচ্ছে মধ্যযুগীয় মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার জড়িত ও নিয়ন্ত্রিত আবর্তিত সমাজ। এখানে অত্যুৎসাহে বেশ্যালয় বন্ধ করে দিলে গৃহস্থ-ঘরের বউ-ঝিরাই যে হবে আক্রান্ত—তা বোঝার জন্যে কোনো বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তবু সরকার জনপ্রিয় হওয়ার জন্যে সারাদেশে ধর্ষণ ছড়িয়ে দিয়েছে। এ হচ্ছে সেই 'মদনভস্মেরই' বৃত্তান্ত। অপ্রতিরোধ্য প্রাণী-প্রবৃত্তির ধারণা নিয়ে বলা যায় 'ধর্ষণ' বন্ধ করা সমাজপরিবর্তন না করলে সম্ভব হবে না। যৌনজীবন সম্বন্ধে আমাদের দেশ-কাল-প্রয়োজন-অনুগ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। তা হলেই সমাজস্বাস্থ্য বাঞ্ছিত মানে উন্নীত হবে।

১৫. নারী-নির্যাতনের ও মানসিকভাবে নারী-নিপীড়নের মূলে রয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকে পুরুষ-প্রধান সমাজের নানা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ এবং দেশ-কালগত নানা বিশ্বাস-সংস্কার। এর মধ্যে সম্ভোগ্য-সম্ভোক্তা সম্পর্কটাই মুখ্য নইলে নারীকে ও পুরুষকে কি দুই ভিন্ন জাতের বা সম্প্রদায়ের প্রাণী বলে ভাবা সম্ভব? স্বামীসম্ভোগ্য বলেই উচ্ছিষ্ট-অকেজো নারীকে হিন্দু সমাজে পুড়িয়ে মারা হত। আজো পুরুষস্পৃষ্টা বলেই বিধবাবিবাহ ঘৃণ্য।

১৬. ক. ঘরে-সংসারে মা হচ্ছে জননী—সন্তানের নিশ্চিন্ত অভয় আশ্রয়। সন্তান পামর বা নররূপী পশু না হলে কি সে মাকে নির্যাতিত করতে বা হতে দিতে পারে? মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়েই তো আত্মীয় পরিজন পরিবার।

খ. স্ত্রী হচ্ছে যৌন সম্পর্কের প্রিয়া, পরম আকর্ষণের ও আদরের সঙ্গিনী। অমানুষ না হলে তার মন-ভাঙা কোনো বিবেচক স্বামীর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে অনুরাগ অবসিত হলে তাকে একালে ত্যাগ করাই মনুষ্যোচিত কর্ম,—পীড়ন নয়। বস্তুত মায়ের পরেই স্ত্রীই হচ্ছে পুরুষের মর্ত্য জীবনে অভয়শরণ। এ স্ত্রী সন্তানের জননী, বংশরক্ষার উৎস।

গ. আর কন্যা হচ্ছে ঘরে-ঘরে পিতার স্নেহস্নাত সন্তান। ভাইবোনের সম্পর্কও শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে স্বার্থবুদ্ধিশূন্য নিছক গভীর মমতার।

অতএব, জননী-জায়া-জাতা রূপে, মা-স্ত্রী-কন্যা রূপে কোনো পুরুষের কি পর হতে পারে? হতে পারে কি নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার? কাজেই নারীমুক্তি শহুরে সমিতি-করা মহিলাদের বক্তৃতা-নির্ভর নয়। এর জন্যে দেশের নারী-পুরুষের হাজার-হাজার বছর ধরে লালিত শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাবৃত্তিক ধারণা বর্জন করতে হবে। নারী-পুরুষ যে সমান, তার যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য অঙ্গীকার করে সহমর্মিতায় সহাবস্থানে সম্মত থাকতে হবে।

যদি দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-বংশ-ভাষা-সংস্কৃতি-যোগ্যতা, আর্থিক-শৈক্ষিক-সামাজিক অবস্থা অবস্থান নির্বিশেষে কেবল ছেলেমেয়েদের প্রেম-পছন্দের মিলন বা পরিণয়প্রথা এ দেশেও চালু হয়, তাহলেও নারীর অনেক সমস্যার সমাধান মিলবে। সেক্ষেত্রেও অবশ্য মনোমালিন্যে দাম্পত্য টুটবে—ঘর ভাঙবে। তখন প্রতীচ্য দেশের মতোই দাম্পত্য হবে ঠুনকো, ভঙ্গুর, স্বল্পকালস্থায়ী। তবে সমাধিকারের ভিত্তিতে সমকক্ষতায়, সহযোগিতায় ও সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে ঘর বাঁধলে, তাকে একটা ইহজাগতিক ব্যক্তিক ও সামাজিক চুক্তি হিসেবে গ্রহণ বরণ করলে তা হৃদয়গত ট্রাজেডির ও পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ নাও হতে পারে। পেশা-বদলের মতোই

দাম্পত্য-বদলও স্বাভাবিক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের রূপ পাবে। যেভাবেই হোক, সর্বপ্রকারে শাস্ত্রিক সামাজিক নৈতিক সংস্কারের বন্ধনমুক্তিই নারীকে দাম্পত্যে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দেবে সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। আর্থিক স্বনির্ভরতাই নারীকে নিপীড়নমুক্ত করবে। নারীমুক্তি-লক্ষ্যে আপাতত নারীর শিক্ষার ও অর্থকর পেশার ব্যবস্থা করা জরুরি।

ভারতবর্ষীয় শূন্যতা এবং কিছু বাঙলা কবিতা

মীনাক্ষী ঘোষ

শূন্য শব্দটি সব ক্ষেত্রেই জটিল—আভিধানিক অর্থ নাকি কিছুই নয়। অথচ মানুষের বুদ্ধি এবং বোধির ঘোড়-দৌড় বহু যুগ ধরে এই শূন্যতার মাঠেই। অস্তিবাদী কিংবা নাস্তিবাদী—কেউই এর আওতার বাইরে নন।

ঔপনিষদিক ভারতবর্ষ চিরকাল বলেছে একটা কোনো চরম তত্ত্বে পৌঁছানো চাই। সে চরম তত্ত্বের স্বরূপ কেমন? ঋষিরা বলেছেন, সে এ নয়, ও নয়, যা কিছু দেখছি শুনছি কিছুই নয়, তবু সে আছে। হাজার গণ্ডা না-এর মধ্যে হ্যাঁ-এর তত্ত্বকে ধরাই কঠিন। অথচ প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় দর্শনে এই চিন্তার আধিপত্য, এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে বাঙলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন।

বাঙলা কবিতার একেবারে আদিযুগ থেকে যদি আমরা লক্ষ করি তবে দেখব, শূন্য শব্দটি বারে-বারে কবিতার রঙ্গভূমিতে ফোকাস ফেলেছে; যদিও যুগে-যুগে সে ফোকাস লাইটের উপর ভিন্ন রঙের সেলোফেন। "চর্যাপদ"-এ শূন্যতার সাধনাকে আমরা যে রঙে পাই, তা বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর আমলে অনেকটাই পরিবর্তিত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিবর্তনের পিছনে কারণটি কী, এবং এ পরিবর্তিত রূপ ভারতীয় দার্শনিকতার সমর্থন পেয়েছে কিনা, সেটা ভেবে দেখবার বিষয়।

বিংশ শতাব্দীকে বলা হয়েছে 'age of interrogation'। এ সময় মানুষ তার সমস্ত প্রচলিত বিশ্বাসকে আবার নতুন করে বিচার করার প্রবণতায় বড়ো বেশি অস্থিরচিত্ত। এই বিচারক্ষেত্রে যুক্তি (রীজন) মানুষকে এত বেশি গ্রাস করেছে যে তাকেও একটা মোহ বলা যেতে পারে। মানুষ তার আধ্যাত্মিক সত্তাকে এখন সম্পূর্ণভাবে রীজনের ছকে প্রামাণিক গণিতের মতো করে বুঝে ফেলতে চাইছে। অথচ গণিত বা দর্শন—সব ক্ষেত্রেরই চরম তত্ত্বটিকে অনুভবে আনার জন্য যে গভীর বোধ-শক্তি বা বিকশিত চৈতন্যের প্রয়োজন, তা কয়জনেরই বা আছে? তার উপর এই শক্তিলাভের জন্য সাধনাই বা কয়জন বুদ্ধিজীবী করে থাকেন? চিন্তা-শক্তির উপযুক্ত প্রসারের আগেই যে রীজনকে ধরে নেওয়া যায়, তা যে সংকীর্ণ জ্ঞানে আমাদের বিভ্রান্ত করবে, তাতে সন্দেহ কী? অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে পূর্ণ বিচার করতে গিয়ে এবং এ সম্পর্কে দেশবাসীর অন্ধ মোহকে বিনষ্ট করবার শুভ ইচ্ছায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা জড়িয়ে পড়েছেন নূতনতর মোহে। এবং এই মোহটি রীজনের মোহ। ড. নীহাররঞ্জন ধরের "মডার্ন রেনেসাঁস" গ্রন্থটি চমৎকার উদাহরণ। এই ধরনের চিন্তা এবং লেখা আধুনিক কালে বেশ জনপ্রিয়। এই রীজন-মোহ অনুসন্ধানী মানুষকে

নিয়ে যাচ্ছে এক বিশেষ ধরনের শূন্যতার পরিমণ্ডলে।

চর্যাপদে যে শূন্যবাদ পাই, তার সাথে যুদ্ধোত্তর বাঙলা কবিতার শূন্যতাবোধের একটা খুব বড়ো তফাত আছে। আধুনিক শূন্যতার কনসেপটের সাথে যুক্ত রয়েছে একটি ভয়ঙ্কর হতাশ মনোভাব। চর্যাপদের শূন্যবাদ অবসাদযুক্ত নয়, বরং আত্মনির্ভরতার সাধনায় সমুজ্জল। একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ৩৪-সংখ্যক চর্যায় শূন্যতা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে —'শূন্য ও করুণা মিলিত হয়ে একীভূত, যোগীর কায়বাকচিত্ত পরিশুদ্ধ—এ অবস্থায় যোগী দ্বারিকপাদ মহাসুখে প্রবিষ্ট।' অর্থাৎ শূন্যে প্রবিষ্ট হওয়া ব্যাপারটা আনন্দময় এবং এর জন্য কায়-বাক-চিত্তের পরিশুদ্ধি-জনিত সাধনার প্রয়োজন। (অনুবাদ—অতীন্দ্র মজুমদার : "চর্যাপদ")। ২০-সংখ্যক চর্যায় কুক্কুরীপাদ বলছেন, 'সর্বশূন্যতায় পরিপূর্ণ তাঁর মন, তাঁর স্বামী। এই মনের সঙ্গে বা সর্বশূন্যতায় যুক্ত হয়ে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন বা বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন—তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।'

এই-জাতীয় উদাহরণ অজস্র রয়েছে চর্যাপদে। মহামতি বুদ্ধ ঈশ্বর-নামক কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের কথা বলেন নি, বরং বলেছেন আত্ম-উত্তরণের একটা চরম অবস্থার কথা। উপনিষদ যে ব্রহ্মের কথা বলেছেন সেও কি মানুষেরই চৈতন্যময়তার একটা চরম রূপ নয়? নইলে "সোঽহং" কনসেপ্ট দাঁড়ায় না। ঘুরেফিরে একই কথা—

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

এই মনুষ্যত্বের বিকাশ যে কত বেশিদূর পর্যন্ত সম্ভব, আত্মিক উত্তরণ যে কত সীমাহীন, তা গাণিতিক ব্যাখ্যার আওতায় এখনও আসে নি। চরমভাবে চৈতন্যবান হয়ে ওঠা ব্যাপারটা যে কীরকম, তা কোনো শাস্ত্রই এখন অবধি বলে উঠতে পারে নি। এজন্য রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন নি, কারণ সে রূপ মুখে বলা যায় না। তাহলে, শূন্য বলি আর ব্রহ্মই বলি, তা হল মানুষের উত্তরণ-পথের তীর্থপর্যায়। তা অন্য কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, নয় কোনো স্বর্গজাতীয় সুখময় ভূখণ্ডের পরিকল্পনা। "সোঽহম" কিংবা আত্মানং বিদ্ধি"—সবই তো মানুষের ভিতরের ব্যাপারকেই বোঝাচ্ছে, সবই মানুষের বোধ এবং বোধি। মানুষ অসীমরূপে চৈতন্যবান হতে পারে। এই ইনফিনিটি বা অনন্ত প্রসারকে বোঝাতে "শূন্য" শব্দের ব্যবহার।

দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে শূন্যতার কনসেপ্ট মানুষকে সীমাহীন আত্মবিকাশের পথেই ডাক দিচ্ছে। তাহলে আধুনিক যুগে, বিশেষত তিরিশের-চল্লিশের দশকের বাঙলা কবিতায় শূন্যতা শব্দের সাথে বিশেষভাবে হতাশাবোধ এবং অবসাদ জড়িয়ে পড়ল কেন?

লোকশাস্ত্র এবং জনসাধারণ স্বর্গলোকে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপনে সুখী বোধ করতে পারে, আবার এই বিশ্বাসভঙ্গের ফলে তাদের মধ্যে অ-সুখও আসা স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এ আচরণ সন্তোষজনক নয়, যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল কথাই আত্মিক উত্তরণচিন্তা। কিন্তু সাময়িকভাবে হলেও ভারতীয় ভাবনায় তথা বাঙলা নাটকে, উপন্যাসে, কবিতায় নেমে এল এক অন্ধকারময় শূন্যতার বোধ।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর "কবিতার কথা" গ্রন্থে লিখেছেন, 'দেবতায় বিশ্বাস নেই আর···কোন পাহাড়-চূড়োর অপারের আকাশকে দিয়ে কিছু হবে না: সে উপলব্ধির বিষণ্ণতা ক্রমে আত্মনির্ভরতার উজ্জ্বলতায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।' 'উপলব্ধির বিষণ্ণতা' কথাটি লক্ষণীয়; স্পষ্টই মনে হয় এর আগে পর্যন্ত দেবলোকেই পরম আস্থা ছিল; অকস্মাৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফলে সে স্বর্গচ্যুতি ঘটে যাওয়ায়, উপলব্ধি বিষণ্ণময় হয়ে উঠেছে এবং আত্মনির্ভর হবার চেষ্টাও অগত্যা করতে হচ্ছে। এই সময়ের কবিতার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অবসাদ আর বেদনা, যদিও সেই ভাবনাই কবিতাকে অপূর্বতা দিয়েছে।

'সব চিন্তা প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়।'
(বোধ : জীবনানন্দ দাশ)

এই বিষণ্ণতা এবং হতাশাকে যতই আর্টিস্টিক করে তোলা যাক না কেন, এ মনস্তত্ত্ব জনস্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর নয়। এই মন স্পষ্টই বিনষ্টিবোধে এবং অবক্ষয়ের চেতনায় অত্যন্ত বেশি বিমর্ষ। হেমন্তে যে মাঠের ধান কাটা হয়ে গেছে, যার সম্মুখে এক ক্লান্ত অবসন্ন শূন্যতা, এক সবহারানোর নিদারুণ যন্ত্রণা—সেই রকম পটভূমিকে জীবনানন্দ বেছে নিয়েছেন। এ শূন্যতার অর্থ না ত্যাগ, না অসীমতা-বোধ। এইখান থেকে 'মাঘসংক্রান্তির রাতে' উত্তরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এই উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির দিকে জীবনানন্দের তেমন দৃষ্টি ছিল না। "সুচেতনা" কবিতায় দেখি জীবনানন্দ 'সূর্যোদয়' কথাটিকে নতুনভাবে ব্যবহার করেছেন যে, আশার আলো, পূর্ববর্তী কবিতাগুলিতে দেখা যায় নি। 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী ···'র সূর্য-চরিত্রের এখানে উত্তরণ ঘটেছে। তবুও এই কবিতাতেই আমরা অনুভব করি কবির নতুন মননের পিছনে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা নেই। এ কারণেই আশার বাণী শোনাতে গিয়ে ঘটে গেছে শৈল্পিক অসাচ্ছন্দ্য। অথচ যেখানে জীবন একঘেয়ে ক্লান্তির শিকারমাত্র, এবং বড়োই নিরর্থক, সেই বোধেই জীবনানন্দের কলম আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করেছে। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে "বনলতা সেন" পর্যন্ত কবিতাগুলি পড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে হয় যেন কোনো হাজারশতাব্দীব্যাপী প্রয়াসের অন্তহীনতাকে জানা হয়ে গেছে। যেন জীবনের অপরিহার্য নিরর্থকতাকে মেনে নিতে হচ্ছে। জানার আগ্রহ পর্যন্ত দেখা যায় না; যেন জীবনের সব জানা শেষ হয়ে গেছে। এই জাতীয় বিশ্বাস কবির মনে এত গভীর যে নক্ষত্রপ্রসঙ্গও তাঁর কবিতায় আশ্বাসে উদ্দীপ্ত করে না, ঐশ্বর্যের সন্ধান দেয় না; যেমনটা আমরা পেয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের আকাশভরা তারার আলোয়। হেমন্তের কুয়াশায় অস্পষ্ট নক্ষত্রের আলো কবির শূন্য হৃদয়টির কাছে কিঞ্চিৎ শুশ্রূষার হাত বাড়িয়েছে মাত্র—

তুমি আর আমি
ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মত চুপে থামি
সেইখানে রব পড়ে।—
সেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের
আলো পড়ে ঝরে।

জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে এক হতাশা, বিষণ্ণ শূন্যতার বোধ। তিনি বলেছেন—

'গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা
লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
... ...
অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল
শব্দে জেগে উঠব না আর

'অরব' শব্দটি লক্ষণীয়—যাতে নীরবের মিষ্টতা নেই। কবি অরব বিশেষণ প্রয়োগে অন্ধকারের কঠিন অ-ব্যাখ্যাত শূন্যতাকে নিজের বুকের ভিতর থেকে অনায়াসে প্রসারিত করে দিয়েছেন পাঠকের চেতনায়। আবার ঠিক একইভাবে 'উটের গ্রীবার মত নিস্তব্ধতা'র কথা যখন তিনি বলেন তখন মুহূর্তে এক বিশাল মরু-রিক্ততা পাঠককে গ্রাস করে।

জীবনজিজ্ঞাসার এই একই পরিণাম বিষ্ণু দের যন্ত্রণাময় 'ত্রিশঙ্কু' অবস্থার জন্য দায়ী, যদিও সুর সেখানে ভিন্ন।

(ক) দিন কাটে নিত্যতৃপ্তিহীন
রাত্রিও প্রশান্তিহীন—
ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়
—উর্বশী ও আর্টেমীস

(খ) দিনান্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল
নিবিড় শূন্যতার ছবি—অশ্বিষ্ট : অশ্বিষ্ট

(গ) দিন মোর ক্লান্ত হতশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মত
—কবি কিশোর : চোরাবালির

এই রুদ্ধশ্বাস বিবর্ণ অস্তিত্বের ছায়া বার-বার বিষ্ণু দের কবিতায় এনেছে নরকের চিত্রকল্প। যেমন,

(ক) নরকে আমারও যাত্রা
(খ) পিছনে নরকযাত্রা
(গ) দান্তে নরকে এ জীবন লেলিহান
(ঘ) নরকে দিও না বলি
(ঙ) নরকের পরে এ রচনা···ইত্যাদি।

তবে বিষ্ণু দে সম্পর্কে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সময় কিংবা মৃত্যুবোধের চাপ এই বলিষ্ঠ কবিকে হতাশায় নিমজ্জিত করে ফেলতে পারে নি। কিন্তু সেকথা মনে রেখেও বলা যায়।—শূন্যতা শব্দের ভিতরে তিনি কোনো অসীম আত্মবিকাশের পথকে খুঁজে পান নি। তাঁর কবিতার একটা বড়ো অংশ যুগগত নেতিবাচক শূন্যতায় যন্ত্রণাময় হয়েছে সন্দেহ নেই।

যুগগত হতাশা ও শূন্যতার নিদারুণ যন্ত্রণা চেপে ধরেছে সে যুগের অন্যতম প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার আকাশকেও।—

তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে
মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু
অবলুপ্ত অতল অভাবে
তোমার অজস্র দান
বরঞ্চ গিয়েছে রেখে নেতির প্রমাণ।
—কস্মৈ দেবায় : অর্কেস্ট্রা

হতাশ কবি ক্রমেই ডুবে গেছেন নরকের কর্দমে।

অমেয় জগতে—
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ
মানুষের মর্মে-মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত নরকের কীট
শুকায়েছে কালস্রোত,
কর্দমে মেলে না পাদপীঠ
—নরক : ক্রন্দসী

স্পষ্টই দেখা যায়, একালীন কবিতার জগতে প্রতিফলিত এক অস্থির দুঃখী কবিমানস যার সম্মুখে অন্ধকারময় শূন্য। এঁরা একটা প্রচলিত বিশ্বাসের উপর আস্থাবান হতে চেয়েও পারেন নি। কিন্তু এ অস্থিরতার কারণ কী? বুদ্ধিজীবী মানুষের অনুসন্ধান খামোকা অলীক স্বর্গের পায়ে মাথা কুটতে গেলই বা কেন, আর বিফল হয়ে হতাশার শিকার হলই বা কেন? সুদীর্ঘ পরাধীনতার জন্যই কি ভারতবর্ষ সাময়িকভাবে নিজস্ব আত্মতত্ত্বের শিক্ষা থেকে সরে এসেছে? অথবা মহাযুদ্ধের বাতাসেই ছিল সংশয় এবং ফ্রাসট্রেশনের বিষ? নাকি বিদেশী-সাহিত্য-প্রীতিই এর জন্য দায়ী?

ধর্মকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে গিয়ে মানসিক বিপর্যয়ের ঘটনাটি আমাদের দেশের অনেক আগেই ঘটেছিল বিদেশে। ফরাসি বিপ্লবেরও আগে থেকে বিদেশী শিল্পে দেখা গেছে সংশয়প্রসূত নানা যন্ত্রণার প্রতিফলন। রুশো যখন ১৭৭১ সালে সভ্যতাকে অভিযুক্ত করলেন তখন থেকেই বোধ হয় এর সূত্রপাত। ১৭৭১ সালে তাহিতি নীতি সম্পর্কে যে বাণী উচ্চারিত হল তার মধ্যে ধ্বনিত হল খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস এবং সভ্যতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাদীদের তীক্ষ্ণ সংশয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গর্গ্যাঁর আঁকা **"Never More"** ছবিটিতে দেখি সংশয়বিধৃত নতুন যুগের ছবি। এ সময়কার শিল্পে এবং সাহিত্যে ক্রমে বিস্তৃত হতে লাগল সংশয়বিধ্বস্ত মানস। তৎকালীন চিত্রশিল্পে তাহিতি নারী ও পুরুষদের মুখে নেই হাসি, দেহে নেই নাচের ছন্দ।

এরপর বিদেশে এল নতুন-নতুন আবিষ্কার এবং মতবাদের জোয়ার যার ধাক্কা ভারতবর্ষের তটেও বহুল পরিমাণে আঘাত করেছে। ১৮৯৮তে আবিষ্কৃত হল রেডিও অ্যাক্টিভিটি; ১৮৯৯তে বিকিরণতত্ত্ব। তারপর আইনস্টাইন বদলে দিলেন 'দেশ-কাল' সম্পর্কিত বহুকালের ধারণাকে। রিলেটিভিটির তত্ত্বে বিচলিত হল মানুষের ধ্রুবসত্যের ভূমি। কাল আর চিরন্তন চরিত্র নিয়ে আশ্রয় দিল না মানুষের বিশ্বাসকে। এরপর এল ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা। তিনি বললেন, চেতন

মনের সর্ববিধ চিন্তা অবচেতন দ্বারা একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত। চৈতন্যকেন্দ্রিক চিন্তাধারা অতএব দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল। অপরদিকে মার্কসবাদ গড়ে তুলতে লাগল ব্যক্তিসত্তাবিলুপ্ত এক সমাজকেন্দ্রিক মানসিকতা। এত রকম উথালপাথালের সাথে আবার যুক্ত হল দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। এইসব মিলে-মিশে আধুনিক যুগের বিদেশী কবিতা এবং বাঙলা কবিতাও। বিদেশী কবিতার কাছে তো চিরকালই আমরা ঋণী। অতএব এলিয়ট, মালার্মে, ভালেরি, র‍্যাঁবো প্রভৃতিরা জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের প্রভাবিত করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশী শূন্যতা খুবই অনায়াসে আমদানি হয়ে গেল এদেশী শিল্পে। এদেশের কবি লিখলেন,

দূর দিগন্তে সংবৃত শর্বরী
শুক্র সুদ্ধ এখনও দেয় নি দেখা;
নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা
—ভ্রষ্টতরী : দশমী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

চল্লিশের দশকে বিশেষ জনপ্রিয় বাঙলা কবিতার এই নিরবলম্ব ভাবটি পাঠকমহলকে স্মরণ করায় বিদেশী কবি মালার্মের কথা। মালার্মে নীল আকাশের প্রতি ভালোবাসার মৃত্যু ঘটিয়ে ক্রমশ প্রবেশ করেছেন শূন্যতার মধ্যে। এই প্রসঙ্গটি অনূদিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের 'নীলিমা' কবিতায়।

সুধীন্দ্রনাথের বীতরাগ মন তাঁর কবিতায় জমিয়ে তুলেছে "জ্বালা", "আবর্জনা"-র স্তূপ।

(ক) করিব না পুঁজি
প্রেমের সমাস্তিপে মমত্বে : জ্বালা
—সর্বনাশ : অর্কেস্ট্রা

(খ) তাই আজি তব স্মৃতি, মগ্ন তরী জ্বালার মতো
সহে না আশার ভার, করে হায় বিদ্রূপে বিব্রত।
বিকলতা : অর্কেস্ট্রা

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার নায়ক বিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্বসংশয়ের মধ্যে দিয়ে যুবকত্বে পৌঁছেছে। সে নায়ক লোকান্তরে বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসী নয় বুদ্ধত্বেও। নিঃশেষে ফুরিয়ে যাওয়ার এক অদ্ভুত শূন্যতার বোধ ছাড়া আর কিছুই তার ধারণায় আসে না। এই নায়কের যে শূন্যতার বোধ, তা অসংজ্ঞেয়, অনির্ণেয়, তা শুধু প্রকাণ্ড 'না'। অথচ এ নেতিগর্ভে আত্মসমর্পণ করতে তার অন্তর চায় নি। তবু যেন অনিবার্যভাবে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার নিরুপায় কবিকে কবিকে ঘিরে ধরেছে। সে অন্ধকার

বিগত রশ্মির প্রেতে কণ্টকিত অসংস্তুত অমা
—ভূমা : দশমী

স্পষ্টতই অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্যতার বোধ ভারতবর্ষের স্বকীয় চরিত্রকে প্রতিফলিত করে না।

শূন্যতার এই কনসেপট বুদ্ধিজীবীদের জীবনযন্ত্রণা কেবল বাড়িয়েই তুলেছে। তবুও ক্রমাগত বিদেশী কবিদের ছায়ায় আমাদের কবিরা ঊষর শূন্যতার কথা লিখে যান। বিষ্ণু দের কবিতায় শূন্যতার পরিমণ্ডল রচনা করল এলিয়টের "হলোমেন"। তবে অবশ্য এমন অবস্থাটা যে চলতেই থাকল, তা নয়। ক্রমে মানুষ কোনো না কোনো অস্তিবাচক চিন্তাধারায় কাটিয়ে উঠতে চাইল এই যন্ত্রণাকে।

তবে এই শূন্যতাবোধজনিত হতাশাকে কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে দুই দেশের ধর্মীয় প্রেরণা কিন্তু ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমের কবি এলিয়ট এবং অন্যান্য অনেকেই আবার প্রবলভাবে খ্রীকড়ে ধরতে চাইলেন পুরাতন খ্রীষ্টধর্মকে। যে জায়গায় ভারতের মানুষ উৎখাত করতে চেয়েছে দেশের মজ্জাগত সনাতন ধর্মকে, এলিয়ট যেভাবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে আশ্রয় নিয়েছেন, বিষ্ণু দের সৃষ্টিতে সে-জাতীয় ধর্মমুখিতা নেই। কিন্তু বিষ্ণু দেকে চিরকাল নিরবলম্ব ত্রিশঙ্কু অবস্থার মধ্যেও আমরা পাই না। তিনি একসময় বলিষ্ঠ পায়ে ভূমি খুঁজে নিয়েছেন বিপুল মানবসমাজের মধ্যে।

এক হোক এককের বহু বহু বহুধায় এক
সেই একতায় নিঃশেষ হোক এক ও বহুর নেতি
—বহুবড়বা : নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

"সাহিত্যের ভবিষ্যৎ" গ্রন্থে বিষ্ণু দে লিখেছেন, সঞ্জীব রচনাতে তাই শিল্পী ও শিল্পবস্তু ধনুকের টঙ্কারে—ধনু ও ছিলার মত। লক্ষ্যভেদের লক্ষ্য হয়তো সরাসরি চেনা যায় না, ধনুর্ভঙ্গ হতে পারে। তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হল 'চৈতন্য-জ্যাবদ্ধটান।' 'চৈতন্য-জ্যাবদ্ধটান' কথাটি প্রণিধানযোগ্য, যা বিষ্ণু দে-কে শূন্যতার মধ্যে বিনষ্ট হতে দেয় নি। শুরুতে শূন্যতার ধারণা (কনসেপ্ট) কবির মধ্যে হতাশার আঁধার আনলেও কবি সে চিন্তা ছেড়ে আত্মনির্ভরতায় নিজের সৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তিনি কোনো গোষ্ঠীগত ধর্মের ছায়ায় বিশ্রাম নেন নি বটে, কিন্তু জীবনকে স্বধর্মে অনুভব করতে চেয়েছেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে।

...জন্ম মৃত্যু কর্মে
আনন্দে আঘাতে খুঁজি জীবন স্বধর্মে।'
—কোনার্ক দেউল : স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত

জীবনকে যথাযথভাবে অবহিত হবার চেষ্টার মধ্যে খুবই প্রসার লক্ষিত হয় বিষ্ণু দে-র কবিতায়। "জল দাও" কবিতার পথ কবির অন্বেষারই প্রতীক।

আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে। / তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে / তাই চলি সর্বদাই ..'

বিষ্ণু দে-র জীবনচেতনা, মৃত্যুচেতনা এবং সময়-চেতনা এই চলিষ্ণুতায় মহৎ। এই প্রসার সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ব্রহ্ম কিংবা শূন্যতা ইত্যাদির দ্বারা মানুষের উত্তরণকে যে অসীমতার সম্ভাবনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিষ্ণু দে-র কবিতায় তাঁকে আমরা পাই না। শূন্য শব্দের ভিতরে তিনি অসীমের তাৎপর্যকে নির্ণয় করতে পারেন নি। দেশে প্রচলিত ধর্মপথকে ত্যাগ করতে গিয়ে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মূল আশ্রয় থেকেও।

বাঙলা কবিতার কবিতার আধুনিক যুগে প্রচলিত ধর্মগোষ্ঠীর ব্যানার থেকে বেরিয়ে আসবার একটা প্রবল জোয়ার দেখা যায়। "জীবনজিজ্ঞাসা" গ্রন্থে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার লিখছেন—'আমি মায়া-বাদীও নই, চার্বাকপন্থীও নই। ...যদি কিছু সৎ বা সত্য কোথাও থাকে, তবে সে জীবনের অস্থির আবর্তের মধ্যেই আছে।' ওই একই গ্রন্থে অন্যত্র লিখছেন, 'যা জানলে সব জানাই সত্য হয়ে ওঠে, সেইটেকে কেউ জানছি না।'

যুদ্ধোত্তর বাঙলা কবিতার বোধ হয় এটাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। অথচ যা জানলে সব জানাই সত্য হয়ে ওঠে, সেই চরম জ্ঞানের সাধনাই তো ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল কথা। আমাদের দেশের যথার্থ ঔপনিষদিক জ্ঞান থেকে শিক্ষাগতভাবে আমরা দূরে সরে এসেছি দুশো বছরের পরাধীনতার অবকাশে। তার উপর আমাদের নিরবলম্বতা প্রশ্রয় পেয়েছে ইমপোর্টেড শূন্যতাবোধে। একারণে এদেশে জনপ্রিয় হয়েছে বিদেশী নাটকের অনুকরণে লেখা বাদল সরকারের "এবং ইন্দ্রজিৎ"-এর মতো নাটক, যা জীবনকে দেখায় এক হতাশ দুর্বহ বোঝা-স্বরূপ। অথচ এ আমাদের স্বধর্ম নয়।

প্রবন্ধের শুরুতেই আমরা দেখেছি, ভারতীয় দর্শনে শূন্যতার কনসেপ্ট রীতিমত সাধনাসাপেক্ষ এবং তা কখনই অজ্ঞানের হতাশাবাদ নয়। একটা সময়ের বিদেশী সাহিত্যসংশয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার দরুন আমরা বিদেশী দর্শনকে কিন্তু হতাশা-মূলক বলে অভিযুক্ত করতে পারি না। কীর্কেগার্ড থেকে আরম্ভ করে সার্ত্র পর্যন্ত বিশ্বাসের দুটি ধারা দেখা যায়। তারা মধ্যে যে দল ভগবানে অবিশ্বাসী তাঁরাও কিন্তু জীবনটাকে হাহাকারে পর্যবসিত করতে চান নি। নীট্‌সে, সার্ত্র প্রভৃতিরা ঈশ্বরকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু বলেছেন, মানুষকে হতে হবে আরো বেশি শক্তির অধিকারী। অর্থাৎ মোটামুটি-ভাবে স্বদেশে এবং বিদেশে দার্শনিকেরা মানুষের অন্তরের বিকাশকেই জীবনসাধনা মনে করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ এ ব্যাপারে এককাঠি অগ্রসর। মানুষের অন্তরের বিকাশকে ভারতবর্ষ অসীম (ইনফিনিটি)-এর সাথে যুক্ত করেছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ অসীম পরিমাণে সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষ অতিপুরাতন শূন্যতার কনসেপ্ট বিদেশী জামা গায়ে দিয়ে হারিয়েছে তার ইনফিনিটির মহত্ত্ব। অসীমের প্রসারহীন সংকীর্ণ রীজন সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা কবিতার জগৎকে করেছে যন্ত্রণাবিধৃত। অন্তত কিছুকালের জন্য হলেও বাঙালি কবিরা ভুলে গেছেন ভারতবর্ষীয় শূন্যতা জীবনকে শূন্য করে না। করে না দুঃখী, স্বার্থপর ; বরং তা জীবনকে আনন্দময় করে, প্রসারিত করে।

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তি-নাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

নেপালী সাহিত্য

আদিকবি ভানুভক্ত

কিরণশঙ্কর মৈত্র

॥ এক ॥

ভানুভক্ত বিজন অরণ্যে একদা একখানি শিলাখণ্ডের উপর বসে ছিলেন। শিলাখণ্ডের উপর বসে পাখির কাকলি শুনতে-শুনতে তাঁর চোখে তন্দ্রার আবেশ এসে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে তন্দ্রার আমেজ কেটে গেলে দেখতে পেলেন—কাছের তৃণভূমিতে একজন লোক ঘাস কেটে চলেছে। ভানুভক্ত তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে ব্যক্তি উত্তর দিলে—ব্রাহ্মণঠাকুর, আমি একজন গরিব ঘাসি। আপনার পাশের গাঁয়েই থাকি। সারাদিন ঘাস কাটি, দিনের শেষে বাজারে গিয়ে বিক্রি করি। এইভাবে জীবন কাটাই। মাঝে-মাঝে সংসারের খরচ দিয়েও কিছু বেঁচে যায়। সেই টাকা দিয়ে একটা কুয়ো কাটাছি। ভাবি—টাকাপয়সা জমিয়ে কী হবে? মরার সময় তো কিছুই সঙ্গে যাবে না। বরং একটা কুয়ো বানিয়ে দিলে লোকের উপকার হবে এবং মরার পরেও গ্রামবাসীরা অনেকদিন আমার নাম করবে।

দরিদ্র ঘাসির এই কথা শুনে ভানুভক্তের চিত্তে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হল। আবিষ্ট অবস্থায় বেশ খানিকটা সময় থাকার পরে এক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল—

ঘাসি দরিদ্রী ঘরকো তর বুদ্ধি কস্‌তো।
যো ভানুভক্ত ধনী ভইকন আজ ইস্‌তো॥
মেরা ইনার নত সত্তল পাটি কেইছন্।
যে ধনর চীজ হরুছন্ ঘর ভিতর নইছন্॥
এস ঘাসি সে আজ কছরী দিয়েছ আর্তি।
ধিক্কার ছ মোক ন বস্‌হু রাখি কীর্তি॥

(মর্মার্থ : ঐ ঘাসি দরিদ্র, কিন্তু তার হৃদয় কত উদার। সারা জীবন ঘাস কেটে-কেটে তার থেকে অর্জিত অর্থের সামান্য উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করে সে কূপ খনন করানোর মতো দীর্ঘস্থায়ী পুণ্য কাজের বাসনা করছে। আর আমি ভানুভক্ত ধনীর সন্তান হয়েও মানুষের উপকারের জন্য কূপখনন বা পান্থশালাস্থাপনের মতো কোনো সৎচিন্তা করছি না। আমার সব কিছু আমার নিজের ঘরের মধ্যেই। এই ঘাসি আমাকে এক মহৎ শিক্ষা দিল। ধিক্ আমার সৎকর্মহীন জীবনকে!)

আত্মগ্লানির অগ্নিদহনে শুদ্ধ হয়ে কবির মনে যখন এইভাবে প্রথম কবিপ্রতিভার উন্মেষ হল তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। ভানুভক্তের জীবনের এই ঘটনাটির সঙ্গে কেউ-কেউ তমসাতীরে অবগাহন করতে যাবার সময় ক্রৌঞ্চের বিয়োগব্যথায় ক্রৌঞ্চীর বিরহার্তি-কাতর বাল্মীকির সেই অমর শ্লোক রচনার সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারেন।

ক্রৌঞ্চীর গভীর বেদনা যেমন বাল্মীকির হৃদয় আলোড়িত করে কাব্যসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল—দরিদ্র ঘাসির কথাও সেইভাবে ভানুভক্তকে কাব্য-রচনার মাধ্যমে জনসেবার প্রেরণা দিল। আর নেপালী ভাষায় রামায়ণ রচনাকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম হিসেবে গ্রহণ করে ১৮৪১ সালে রামায়ণের প্রথম অধ্যায় 'বালকাণ্ড' সমাপ্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—ভানুভক্ত নেপালী রামায়ণ রচনার মূল ভাবটি গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে।

আদিকবি ভানুভক্তের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দেবার আগে তাঁর জীবনকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। কবি ২৯শে আষাঢ়, ১৮৭১ বিক্রম সম্বৎ (ইংরেজি ১৮১৪ সালের ১৩ই জুলাই) কাটমাণ্ডু থেকে প্রায় একশ মাইল পশ্চিমে তানাহু উপত্যকার রামঘা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকের কাছে তানাহু প্রাচীন সেনবংশীয় রাজাদের উদ্ভবস্থল হিসেবে পরিচিত। এখানে বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ "বাসুদেব রসানন্দ"-প্রণেতা পণ্ডিত শিবশর্মা এবং দেশপ্রেমিক নেপালী রাজনীতিবিদ্ ভীমসেন থাপা জন্মগ্রহণ করেন।

কবির প্রারম্ভিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যায়—পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের কাছে বাল্যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। পরে সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন কাশীধামে গিয়ে। বাল্যকাল থেকেই ভানুভক্তের বুদ্ধিমত্তা এবং ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পিতামহের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে মাত্র বারো বৎসর বয়সেই তিনি জন্মকোষ্ঠীর কঠিন বিষয়গুলি আয়ত্ত করেছিলেন।

ভানুভক্ত নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু পরিদর্শন করেন সর্বপ্রথম ১৮৪৯ সালে। প্রতিবেশীর সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত মামলার ব্যাপারে তাঁকে কাটমাণ্ডু আসতে হয়েছিল। বালাজী নদী ও কাটমাণ্ডু শহরের সৌন্দর্য বর্ণনা করে এই সময় দুটি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেন—যা আজ পর্যন্ত খ্যাতির আলোকে উজ্জ্বল। এই সময় ভানুভক্তের জীবনে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুই-ই যুগপৎ ছায়া ফেলেছিল। মামলায় তাঁর জয় হয়।

ভানুভক্তের পিতা পণ্ডিত ধনঞ্জয় রাজকর্মচারী ছিলেন। কবিও কাটমাণ্ডু আসবার কিছুদিন পরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরের অধীনে হিসাবরক্ষকের কাজ পেলেন। দু বছর তিনি এই কাজ করেন। কিন্তু অঙ্কের নীরস একক-দশক-শতকের রাজ্যে ভানুভক্তের কবিমন খাপ খাইয়ে নিতে পারল না, তাঁর হৃদয় উধাও হয়ে যেতে চাইল ভাবকল্পনার অবাধ জগতে। কল্পনা এবং বাস্তবের এই বৈষম্যের অনিবার্য ফল কবিকে ভুগতে হল। হিসাবের গরমিল আর ভুলের জন্য পাঁচ মাসের মেয়াদে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। এই কারাবাসের অভিশাপ ভানুভক্তের জীবনে কিন্তু আশীর্বাদ হয়েই দেখা দিল। কারণ এই সময়েই তিনি তাঁর রামায়ণের চারটি অধ্যায়—অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও সুন্দরকাণ্ড রচনা করেন (১৮৫২ সালে)। পরের বছর ১৮৫৩ সালে বাকি অধ্যায় যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড রচিত হল। এইভাবে কবির সাতাশ বছর বয়সে, ১৮৪১ সালে যে রামায়ণের সূচনা হয়েছিল 'বালকাণ্ড' লিখে, বারো বছর পরে ১৮৫৩ সালে তা সমাপ্ত হল। বিশ্বের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতো নেপালী সাহিত্যের অমর সম্পদ ভানুভক্তের রামায়ণেরও অধিকাংশ লেখা হল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ভানুভক্তের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা "বধূশিক্ষা" (১৮৬২), "রামগীতা" (১৮৫৮), "প্রশ্নোত্তরী" (১৮৫৩) ও "ভক্তমালা" (১৮৫৩)। এ ছাড়াও তিনি অনেক খণ্ডকাব্য ও গীতিকবিতা রচনা করেছেন।

॥ দুই ॥

ভানুভক্তের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নের আগে কবির সমসাময়িক নেপালের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর ঈষৎ আলোকপাত অপ্রাসঙ্গিক নয়। কবির জন্ম হয়েছিল অ্যাংলো-নেপাল যুদ্ধের কয়েকমাস আগে। তাঁর সমকালে নেপালের রাজনৈতিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা। ১৮১৪ সালে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নেপালের রাজশক্তি পর্যুদস্ত। আবার ১৮১৬ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পরে ইংরেজ সেনাপতি অকটারলনির সঙ্গে অপমানজনক "সগৌলির চুক্তি" অনুযায়ী নেপাল সরকার গাড়ওয়াল, কুমায়ুন এবং তরাইয়ের অধিকাংশ অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। সিকিম থেকে নেপালী সৈন্য অপসারণ এবং কাটমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেনট রাখাও ছিল চুক্তির শর্ত। যুদ্ধে পরাজয়

এবং অপমানজনক বাধ্যতামূলক সন্ধি সামরিক-গৌরব-ভাবাপন্ন নেপালীদের আত্মাভিমানকে প্রচণ্ড আঘাত হানল। এই দুর্যোগের দিনে যখন বাইরের দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির হাতে গ্লানিময় পরাজয়ের অপমানে নেপালের জাতীয় জীবন আর্ত, ঠিক তখনই অন্তরঙ্গে নেপালের রাজপ্রাসাদে বিস্তৃত হচ্ছিল ষড়যন্ত্রের লূতাতন্তুজাল। এর ফলে সেনাপতি ভীমসেন আত্মহত্যা করলেন। প্রখর রাজনৈতিক দূরদর্শী ও বিবেচক ভীমসেন থাপা চেষ্টা করেছিলেন ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয় রাজশক্তিসমূহকে একতাবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের প্রতিরোধ ও পরাভূত করতে। পানজাবকেশরী রণজিৎ সিং, মারাঠা ও বর্মার শাসক-দের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ তাঁর এই চেষ্টার পরিচয়বাহী। দেশপ্রেমিক ভীমসেন থাপার আত্মহত্যা স্বাধীনতাকামী স্বজাতিদের মনে এক প্রবল আঘাত। জাতীয় জীবনের এই দুর্যোগ-আবর্ত আরও শোচনীয় হল যখন রাণা জঙ্গবাহাদুর সবলে রাজশক্তি অধিকার করে নেপালে অত্যাচারী রাণা-শাসনের সূচনা করেন। শতবর্ষব্যাপী এই শাসনের অবসান ঘটে আজ থেকে মাত্র চার দশক আগে, ১৯৫০ সালে, আরেক বিপ্লবের মাধ্যমে।

এই-সমস্ত দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ফলে নেপালের জনসাধারণের মনে দেখা দিয়েছিল চরম হতাশা। দেখা দিয়েছিল বিপর্যস্ত রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত লক্ষণগুলি, নৈতিক অবনয়ন, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, আদর্শবর্জিত মেরুদণ্ডহীনতা। ভানুভক্ত অনুভব করলেন যে, বিস্রস্ত জাতির বিপর্যস্ত সত্তাকে সুস্থ ও সবল করে তোলার এবং জনসাধারণকে আত্মিক শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করার একমাত্র উপায় হল তাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্‌বোধন। ফলত, নেপালের জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবনয়নের বেদনা ভানুভক্তকে রামায়ণ রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণের সমাবেশ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই নরদেহে বিষ্ণু-অবতার রামগুণমণির জীবনকাহিনী রচনা করে তাঁর পুণ্য দৃষ্টান্তে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সমগ্র জাতিকে।

বস্তুত, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উন্মেষ কবির কাম্য ছিল। তাঁর রচনা ঈশ্বরচেতনার আলোকে উজ্জ্বল। আবার এই অলৌকিক ঈশ্বর-অনুভূতির মধ্যে একটি হতাশার সুরও গুঞ্জিত। নেপালের সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থায় কবিচিত্তের বেদনাই এই হতাশার মূলে। মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ভানুভক্তকে যে কী গভীর-ভাবে আলোড়িত করেছিল, অধ্যাত্ম রামায়ণের 'বালখণ্ডে' তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া আছে—

'সাঁচো বাত গরইন কোহি
আরুকোই গর্‌লন্ ত নিন্দা পনী।
আরুকাকো ধনখানালাই অভিলাশ
গরলন্ আসল হো ভনী॥
কোহি জন্‌ত পরস্ত্রী মা রত
হুনন্ কোহীত হিংসা মহাঁ
দেহই লাইত আত্মজানি রহনন্
নাস্তিক পশু ঝই তহাঁ।'
—বালখণ্ড॥ শ্লোক ৩॥

(মর্মার্থ: [কলিযুগে] সত্যি কথা কেউ বলবে না, অন্যদের নিন্দা করবে। কেউ চাইবে অন্যের ধন আত্মসাৎ করতে এবং সেটাকেই মনে করবে উত্তম কাজ। আবার কেউ হবে পরস্ত্রীরত, কেউ হিংসায় উন্মত্ত। তারা সবাই পশুর মতো নাস্তিক হবে, শরীরটাকেই মনে করবে আত্মা।)

আবার—

'কামকা চাকর ঝই ভয়ের রহনন্
স্ত্রী লাই দেউতা সরী।
মান্‌নন্ পীতৃর মাতৃলাই বুঝি
ঘুপ শত্রু সরীকা গরী॥
ধন আরজন গরর্ডন লা ভনী॥'
—বালখণ্ড॥ শ্লোক ৪॥

ব্রাহ্মণ ভইকনা বেদ বেচি রহনন্
কোহি পড়ুন্তা পনী।
ধন ঠুলো ছ পনী ভন্থা সহজ

(মর্মার্থ: লোক কামুক হয়ে স্ত্রীকে দেবতা বলে মনে করবে। মাতাপিতাকে দেখবে শত্রুর মতো। ব্রাহ্মণ হয়ে বেদ ব্যবসায় করবে। যদি কেউ বেদ পাঠ করে—তা অর্থোপার্জনের জন্যেই এবং ধনসম্পদকেই মনে করবে শ্রেষ্ঠ পার্থিব বস্তু।)

ভানুভক্তকে বলা হয় নেপালী ভাষার 'আদিকবি', স্বভাবতই আখ্যাটি বিতর্ক-অতীত নয়। বিষয়টি আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

নেপালী ভাষা ছয়শত বছরের প্রাচীন। ১৩৫৬ সালে উৎকীর্ণ পৃথ্বীরাজ মল্লের জুমলা-তাম্রলিপিতে নেপালী ভাষার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। ভানু-ভক্তের আবির্ভাবের আগেও অনেক প্রতিভাবান কবি নেপালে জন্ম গ্রহণ করেছেন। নেপালী ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। উদয়ানন্দ, সুবদানন্দ দাস, শক্তিবল্লভ আর্যাল, গুমানী পন্থ, বিদ্যারণ্য কেশরী, বসন্ত শর্মা, যদুনাথ পোখরেল, রঘুনাথ পোখরেল, ইন্দিরস, বীরশালী পন্ত, রঘুনাথ ভট্ট প্রমুখর নাম প্রাক্‌-ভানুভক্ত কবিকুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের শিক্ষা কাশীধামে, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। স্বভাবতই শিক্ষা-সমাপনান্তে এঁরা হতেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সংস্কৃত দেবভাষা। পূজাপার্বণ, ক্রিয়াকর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান—সর্বত্রই ছিল সংস্কৃতের ব্যাপক ব্যবহার। বিস্ময়কর নয় যে, কাব্যের অঙ্গনেও ছিল সংস্কৃতের আধিপত্য। কেউ-কেউ নেপালী ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন বটে, কিন্তু শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনের দিক দিয়ে সংস্কৃত, আরবি, মৈথিলী ও ভোজপুরী ভাষার মিশ্রণ ও প্রবল প্রভাবে তা হয়ে উঠত জটিল। বিশেষত, অভিজাত সম্প্রদায় ও পণ্ডিতবর্গের সংস্কৃত ভাষার প্রতিই ছিল গভীর মমত্ব-বোধ আর নেপালী ভাষার প্রতি আত্যন্তিক অবজ্ঞা আর অনীহা। তাঁরা নেপালীকে ভাবতেন—সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের ব্যবহৃত ভাষা। স্বভাবতই এইসব সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সৃষ্ট সাহিত্য শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। নেপালের সাধারণ মানুষ এইসমস্ত রচনার রসাস্বাদনে সমর্থ হত না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে—সরকার নেপালী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলেও এই ভাষা সে যুগে যথার্থ রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদাও লাভ করে নি। এই স্থলে নেপাল-ইতিহাসের অতীতের দুয়েকটি পাতার উপর দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। আধুনিক নেপাল রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন পৃথ্বীনারায়ণ সাহ। পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল জয় করার আগে এ রাজ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। পৃথ্বীনারায়ণ সাহ সমগ্র নেপাল জয় করার আগে এই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে অনেকগুলি উপভাষা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে নেওয়ারী, তামাং রাই, লিম্বু, থারু, চেপাং, গুরুং, মংগর, সুনওয়ার, হাইউ, দনওয়ার, শেরপা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নেপালী ভাষার গঠনে এই উপভাষাগুলির অল্প-বিস্তর অবদান অবশ্য স্মর্তব্য।

প্রত্যেক রাজ্যের ভাষা পৃথক থাকায় একে অন্যের ভাষা বুঝত না। তাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে অনেকাংশেই ছিল বিভিন্নতা। পৃথ্বীনারায়ণ ১৭৬৮ সালে কীর্তিপুর রাজ্যটিও জয় করে নেপালকে এক অখণ্ড রাষ্ট্রের রূপ দিলেন। আর আপন ভাষা নেপালীকেই ঘোষণা করলেন নেপালের রাজভাষা বলে।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভানুভক্তের রামায়ণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বিজয়ী নেতা নেপালী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলেও নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন-ভাষাভাষী তাদের দীর্ঘদিনের নিজস্ব ভাষা ত্যাগ করে নতুন একটি ভাষা শিখতে তেমন আগ্রহ বোধ করত না। কিন্তু ভানুভক্ত চিরন্তন মানবিক আবেগ-সম্পৃক্ত একটি ধর্ম-কাব্য রামায়ণ রচনা করায়, যারা

এই ভাষা অল্প-স্বল্প বুঝত তারা ভানুভক্তের রামায়ণ পাঠের মাধ্যমে অজান্তে স্বেচ্ছায় এই সহজবোধ্য ভাষা আয়ত্ত করে ফেলল, আর যারা এই ভাষায় একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল, ভানুভক্তের রামায়ণের আকর্ষণে অন্যের সংসর্গে ধীরে-ধীরে তারাও সহজ সরল নেপালী ভাষার মর্মে প্রবেশ করতে শুরু করল। বহুজনের ব্যবহারের ফলে একটি সহজবোধ্য সার্বজনীন রূপ পেতে শুরু করল নেপালী ভাষা। বর্তমান লেখকের ধারণায়, ভানুভক্তের রামায়ণের এটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান।

ভানুভক্তের আগে রঘুনাথ উপাধ্যায়ও রামায়ণ লিখেছিলেন কিন্তু সেই রামায়ণে সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার ঘটায় তা সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে নি। ভানুভক্ত সংস্কৃতের আনুগত্য অস্বীকার করে, প্রাচীন রীতির অচলায়তন ভেঙে সহজবোধ্য নেপালী ভাষায় কাব্য রচনা করেন। ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, দ্রুতবিলম্বিত, বসন্ততিলক, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, শার্দূল-বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ অত্যন্ত সরল ও সুললিত করে ভানুভক্ত তাঁর রামায়ণে ব্যবহার করেছেন। চার পঙক্তির সহস্রাধিক শ্লোকের কোথাও সংস্কৃতের কঠিন ও ক্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেন নি। পূর্বাপর তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। মূলত অধ্যাত্ম রামায়ণকে অনুসরণ করলেও নেপালী জনমানসের অনুগামী করে আপন মনের মাধুরীও মিশিয়েছেন রামকাব্যে। তাই পড়বার সময় তাঁর রামায়ণকে মৌলিক রচনা বলে মনে হয়। আর এইজন্যেই রঘুনাথ উপাধ্যায়ের রামায়ণের তুলনায় ভানুভক্তের রামায়ণ অনেক বেশি জনপ্রিয়, এইজন্যেই সার্থক ভানুভক্তের 'আদিকবি' বিশেষণ।

॥ তিন ॥

রামায়ণ প্রধানত ধর্মগ্রন্থ। লোকের বিশ্বাস—এই গ্রন্থ পাঠ করলে ইহলোকে পুণ্য ও পরলোকে মুক্তি। তাই কেবল সাহিত্য-আস্বাদনের জন্যে নয়, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে রামায়ণের পাঠ ব্যাপক। ভানুভক্তের রামায়ণ সরল-সাবলীল হওয়ায় সাক্ষর ব্যক্তিরাও তাঁর রামায়ণকে আশ্রয় করলেন। এই গ্রন্থ সমানভাবে আদৃত হল ধনীর অভ্রংলিহ প্রাসাদে আবার দরিদ্রের পর্ণকুটিরে। বাঙলায় যেমন কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করে তার সুললিত প্রসাদগুণ, কাব্য-গরিমা ও ব্যাপক ব্যবহারে 'আদিকবি' আখ্যা পেয়েছেন, হিন্দিভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে যেমন তুলসী-দাস সহজ সাবলীল কাব্যসৌন্দর্যে রামায়ণ লিখে বিপুল বিশাল জনমানসে রামনামের রসাস্বাদন ঘটিয়েছেন, তেমনি ভানুভক্তও সহজ সরল মাধুর্যময় ভাষায় রামায়ণ রচনা করে এক ভাষার প্রভাবে নেপালের রাষ্ট্রীয় ভিত্তির বনিয়াদকেই করেছেন দৃঢ়তর। এই কৃতিত্বের জন্যেই বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি নেপালীভাষাভাষী মানুষের মনের মণিকোঠায় পরম শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে ভানুভক্তের মূর্তি অম্লান আর ভাস্বর।

"বধুশিক্ষা" ভানুভক্তের একখানি জনপ্রিয় বিখ্যাত গ্রন্থ। এই পুস্তক রচনার পশ্চাতেও একটি কাহিনী বিদ্যমান। ১৮৪৯ সালের পরে ভানুভক্ত প্রায়ই কাটমাণ্ডু যাতায়াত করতেন। এখন যে অঞ্চলে 'বীর হাসপাতাল', সেখানে ছিল তাঁর আবাস-ভূমি। যা হোক, ১৮৬২ সালে কাটমাণ্ডু যাবার পথে একদা তিনি তাঁর বন্ধু তারাপতির গৃহে অবস্থান করেন। রাতে বন্ধুপত্নী ও তার পুত্রবধূর কলহ-কোলাহলে কবির ঘুম ভেঙে গেল। সেই দিন রাতেই কবি চারপঙক্তিবিশিষ্ট ত্রিশটি কবিতা রচনা করেন এবং পরদিন প্রাতে বন্ধুপত্নীর হাতে দেন। এই কবিতা-গুচ্ছে পরিবারের কর্ত্রী গৃহলক্ষ্মী কল্যাণী বধূর কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে।

কবির অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় "ভক্তমালা" ও "প্রশ্নোত্তরী" দুটি গ্রন্থই ধর্মবিষয়ক। "প্রশ্নোত্তরী" গ্রন্থে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার

বিভিন্ন দিকে আলোকপাত। যেমন—

'কুন্‌হো সহজ মোক্‌ছ গরায়ি দিন্‌ছ।
জ্ঞানহো অরুকো কিন নাম লিন্‌ছ্যা ॥'

(মর্মার্থ : (প্রশ্ন) মোক্ষ সহজে কেমন প্রাপ্তব্য হয় ?
(উত্তর) জ্ঞানের অনুসরণেই মোক্ষ লভ্য হয়।)

অথবা—

'দরিদ্র নাউ নরমা ছ যস্‌কো।
বিশাল তৃষ্ণা ঘরমা ছ যস্‌কো ॥'

(মর্মার্থ : (প্রশ্ন) মানুষের মধ্যে দরিদ্র কে বিশেষ ?
(উত্তর) সেই লোক যার তৃষ্ণার নেই শেষ।)

মৃত্যুর পূর্বে কবি ১৮৬৮ সালে তানাহুনে বসে "রামগীতা" রচনা করেন। শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি 'রামগীতা'র শ্লোকগুলি মুখে-মুখে রচনা করতেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র রামনাথ তা লিখে নিতেন। এখানিও ধর্মপুস্তক।

কবির মৃত্যু-তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকলেও তাঁর জীবনীকার মোতিরাম ভট্টের মতে ১৯২৫ বিক্রম সম্বৎ (ইংরেজি ১৮৬৮ সালের ২৭শে সেপটেমবর) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

যে-কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মূলে ভাষার ভূমিকা অবিসংবাদিত। পৃথ্বীনারায়ণ সাহ যদি সমগ্র নেপাল জয় করে ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা আনয়ন করে থাকেন, উনিশ শতকে নেপালের উজ্জ্বল নক্ষত্র ভানুভক্ত যথার্থ রাষ্ট্রীয় বোধের ঐক্য স্থাপন করেছেন বিভিন্নভাষাভাষীর লোকেদের মাত্র একটি ভাষার সূত্রে গেঁথে। নেপালী ভাষাকে উপভাষার স্তর থেকে উন্নীত করে যথার্থ উপভাষার যোগ্যতা ও গৌরব দানের কৃতিত্ব আচার্য ভানুভক্তের।

অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে সমাজসচেতনার বেণীবন্ধন ঘটেছিল ভানুভক্তের সাহিত্যে। সমসাময়িক সামাজিক দুর্নীতির ও রাণাতন্ত্রের সমালোচনা—যা তাঁর পূর্বের লেখকদের রচনায় অনুপস্থিত, ভানুভক্তের সাহিত্যকে প্রাণবন্ত ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। কবির রচনায় লঘু কৌতুকের মধ্যে কোথাও কোথাও ঝলসে উঠেছে ব্যঙ্গের শাণিত তরবারি। তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করা যেতে পারে বেদনা-ভারাক্রান্ত মেঘের অন্তরালে অকস্মাৎ সূর্যরশ্মির ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ তির্যক আলোকপাত। হিসাবের গরমিল ঘটায় কবি যখন কুমারীচোকের কারাগৃহে বন্দী (১৮৫২) তখন বিচারককে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনা করেছিলেন—

'রোজ রোজ দর্শন পাউছু
চরণকো তাপ ছইনা মনমা কছু।
রাতভর নাচপানি হেরছু খরচ না গরি
ধূলা চয়ন মা মছু।
লামখুটে ওপিয়াঁ উরুস্ ই
সঙ্গীছন ইনকাই লহড় মা বসী।
লামখুটে হারু গাঁউছন ই
ওপিয়াঁ নাচছন ম হেরছু বসী ॥

(মর্মার্থ : (হে মহামান্য বিচারক মহোদয়,)
রোজ রোজ আপনার দর্শন পাচ্ছি
আমার হৃদয়ে কোনো চিন্তা নেই।
সারা রাত পয়সা খরচ না-করে
নাচ গান শুনছি, বেশ মজায় আছি।
মশা, উচ্চিংড়ে, ছারপোকা—
এরাই আমার সঙ্গী, এদের সঙ্গে বাস করি
মশা গান গায়, উচ্চিংড়ে নাচে
আমি বসে বসে দেখি ॥)

বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সাবলীল বাগধারার সঙ্গে রসাত্মক ব্যঞ্জনা, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনা, বিষয়বস্তুর শৈল্পিক রূপায়ন, রস-মধুর দৃষ্টিভঙ্গী ভানুভক্তের রচনাকে অনন্য অগ্রগামী সাহিত্যিকের সম্মান দিয়েছে—যে সম্মান ইংরেজি সাহিত্যে জিওফ্রে চসারের, ফরাসিতে রেবেলার, সারভান্তের স্পানিশে, গিয়োভানি বোক্কাচ্চিয়ো-র ইটালীয়তে এবং মার্টিন লুথারের জর্মন ভাষা ও সাহিত্যে।

চীনের আধুনিক কবি আই ছিঙ

প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়

পেইচিং শহরের পূর্বাঞ্চলে একটি ছোটো গলিতে লাল-দরজা-দেওয়া চীনের পুরনো ধাঁচের একটি বাড়িতে সস্ত্রীক বসবাস করেন চীনের আধুনিক যুগের সবচেয়ে নামকরা কবি আই ছিঙ। ১৯৪৯ সালে চীনের মুক্তির পর সাহিত্যিক বা কবিদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলেন আই ছিঙ। অবশ্য তাঁর বহু নামকরা কবিতাই চীনের মুক্তির আগে রচিত। আমার সাথে এই আশি বছরের বৃদ্ধ কবির সাক্ষাৎ হয় তাঁর বাসভবনে গত তেসরা জুলাই। তার কিছুদিন আগেই তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তাঁর ডান হাতের উপরের অংশে ফ্র্যাকচার হবার ফলে সেখানে একটি লোহার অঙ্গ বসানো হয়। ডান হাতখানি তুলতে তাঁর বেশ কষ্টই হয়। আর হাতের পাতাটিও ক্রমাগত কাঁপে। আই ছিঙ সকরুণ সুরে বললেন, 'জীবনে একটা চৌকাঠের পর আরেকটা চৌকাঠ পেরলাম, তারপর আরেকটা, এমনি করে আরও অনেক। এখন হাত ভেঙেছে, এরপর জানি না এর চাইতেও কষ্টদায়ক আর কী অপেক্ষা করছে আমার শেষ জীবনে।'

সত্যি, আই ছিঙের জীবন হল নানাবিধ মর্ম-বেদনা আর দুর্দশার কাহিনী। ১৯১০ সালের ২৭শে মার্চ তাঁর জন্ম হয় পূর্ব চীনের চেচিয়াং প্রদেশের এক পাহাড়ি গ্রামে। দুটি দিন যন্ত্রণাভোগের পর আই ছিঙের মা শিশুটির জন্ম দেন। গ্রামে এমনই এক অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে ভূমিষ্ঠ হবার আগে প্রসবযন্ত্রণাদায়ী শিশু অত্যন্ত অশুভ। তাই আই ছিঙের পিতা—গ্রামের এক জমিদার চিয়াঙ কিংচুন্ নিজের পুত্রসন্তানটিকে বিদায় করেন নিজের বাড়ি থেকে। গ্রামের এক দরিদ্র চাষির স্ত্রী তা ইয়েন্‌হো নিজের কন্যাসন্তানটিকে ডুবিয়ে মেরে নিজের বুকের দুধে মানুষ করে আই ছিঙকে। পাঁচটি বছর তা ইয়েনহোর যত্নে পালিত হয়ে শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ফিরে যেতে হয় বাবা-মার কাছে। ১৯২৮ সালে তিনি ভরতি হন হোঙডউয়ের "পশ্চিম হ্রদ" ললিত-কলা বিদ্যালয়ে। ১৯২৯ সালে শাঙহাই থেকে সমুদ্রপথে তিনি ফ্রান্সে যান উচ্চশিক্ষালাভের আশায়। তাঁর পিতা তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। আই ছিঙ রোজ সকালে পাঁচমিশেলি কাজ করে ছ পয়সা রোজগার করতেন আর বিকেলে ছবি-আঁকা শিখতেন। তাঁর চীনা আর ফরাসি সাহিত্যের রসাস্বাদনের সূচনা হয় ঠিক এই সময়েই। আই ছিঙের আসল নাম ছিল চিয়াঙ হাইছ্যঙ। একবার প্যারিসের এক হোটেল ম্যানেজার তাঁকে চিয়াঙ কাইশেক বলে ভুল করে। তখন বিরক্ত হয়ে তিনি নিজের নামটি কেটে আই ছিঙ লিখতে শুরু করেন। ১৯৩২ সালে আই ছিঙ শাঙহাই ফিরে আসেন। সেই বছরের জুলাই মাসে কুওমিনতাঙ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হন সরকার-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের অভিযোগে। তাঁকে ছ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কারাগারে বসেই ১৯৩৩ সালের ১৪ই জানুয়ারি তিনি রচনা করেন একটি নামকরা স্মৃতিরোমন্থক কবিতা "তা ইয়েন্‌হো—আমার ধাইমা"। কবিতাটি ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় "আই ছিঙ" ছদ্মনামে। তিনি কারামুক্ত হন ১৯৩৫ সালের অকটোবরে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে চিয়াঙ কাইশেক-নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাং সরকার তৃতীয়বার কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানে নামে এবং তখন ছুঙছিঙ (বা, চুঙকিঙ) শহরের প্রতিটি লেখকের পেছনে গুপ্তচর

নিযুক্ত করা হয়। তখন চউএনলাইয়ের নির্দেশে তাঁকে সরকারি অফিসারের ছদ্মবেশ পরিয়ে ছুঙছিঙ শহর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি অবশেষে ইয়েন্‌আন্ (কমিউনিস্টদের ঘাঁটি) পৌঁছন ৮ই মার্চ। ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন লু শুন সাহিত্য ও কলা বিদ্যায়তনে। সেই বছরেই তিনি মনোনীত হন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে। ১৯৪৯ সালে তাঁর একটি পদ্যসংগ্রহ "বিজয়ের পথে" প্রকাশিত হয়। অকটোবরে তিনি নিযুক্ত হন "রেন্‌মিন্ ওয়েন্‌শুয়ে" (গণসাহিত্য) পত্রিকার সহসম্পাদকরূপে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় কবিতা-সংকলন। জুলাই মাসে আই ছিঙ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটির প্রতিনিধি-দলের সাথে যান সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯৫৪ সালে তিনি এবং আরো ছজন চীনা সাহিত্যিক মৈত্রীসফরে চিলি যান সে দেশের লোকসভার সভাপতির আমন্ত্রণে। চিলি যাবার পথে তাঁরা ভ্রমণ করেন মস্কো, প্রাগ, ভিয়েনা, জেনেভা, লিসবন, ঢাকা, রিও ছ জানেইরো এবং বুএনোস্ আয়রেস্। "দক্ষিণ আমেরিকা সফর" বইখানি হল তাঁর সেই সময়কার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার এক অপূর্ব প্রকাশ। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে চিলির কবি পাবলো নেরুদা এবং ব্রাজিলের লেখক হোর্গে আমাদোকে অভ্যর্থনা জানাতে আই ছিঙ খুন মিঙে যান। তারপর তাঁদের ঘুরিয়ে দেখান ছুঙছিঙ, উহান্ আর পেইচিঙ শহর। ইতিমধ্যে মাও ৎসেতুঙের "দক্ষিণপন্থী-বিরোধী আন্দোলন" শুরু হয়ে গেছে। প্রখ্যাত লেখিকা তিঙলিঙ-কে "দক্ষিণপন্থী" আখ্যা দেবার বিরুদ্ধে আই ছিঙ প্রতিবাদ জানানোর ফলে তাঁকেও "দক্ষিণপন্থী" বলে ঘোষণা করা হয়। এবং তিনি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। আই ছিঙ আর তাঁর স্ত্রী কাও ঈঙ-কে পাঠানো হয় উত্তর-পশ্চিম চীনের শিনচিয়াং প্রদেশে ১৯৫৯ সালে। ১৯৬৬ সালে শুরু হয় ভয়াবহ "সাংস্কৃতিক বিপ্লব"। ১৯৬৭ সালে আই ছিঙ-কে পুনরায় পাঠানো হয় শিনচিয়াঙের একটি খামারে। সেখানে তাঁকে রোজ পনেরোটি শৌচাগার পরিষ্কার করতে হত। তাঁকে সস্ত্রীক থাকতে দেওয়া হয়েছিল ভূগর্ভস্থ একটি ছোটো ঘরে যেখানে সাধারণত ভেড়ারা সন্তান প্রসব করত। সেই ছোটো খুপরিঘরে লণ্ঠনের অল্প আলোয় পড়াশোনা করার ফলে তাঁর ডান চোখখানি নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে চোখের চিকিৎসার জন্য যখন তিনি পেইচিঙ প্রত্যাবর্তন করেন, তখনই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাঁর ডান চোখটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালে শিনচিয়াঙ থেকে সরকারি অনুমতি নিয়ে আবার তাঁকে পেইচিঙ যেতে হয়—যখন তাঁর বাঁ চোখে গোলমাল দেখা দেয়। সেবার তিনি পেইচিঙেই থেকে যান। ১৯৭৬ সালে মাও ৎসেতুঙের স্ত্রী চিয়াঙ ছিঙের নেতৃত্বাধীন "চার কুচক্রী"-র পতনের পর আই ছিঙের কলমের ডগায় রচিত হয় বহু কবিতা। ১৯৭৯ সালের মার্চে আই ছিঙকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে পুনর্গ্রহণ করা হয় এবং পূর্বপদ প্রত্যর্পণ করা হয়। আই ছিঙের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী তথা গুণমুগ্ধ পাঠিকা চেকোস্লোভাকিয়ার দানুশকা (যিনি ১৯৫৪ সালে আই ছিঙের প্রাগ-ভ্রমণকালে দোভাষী ছিলেন) ১৯৭৬ সালে মারা যান সড়ক দুর্ঘটনায়। তাঁর দ্বিতীয়বার চীনে যাবার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। ১৯৭৮ সালে আই ছিঙ তাঁর সেই অতিপরিচিত বান্ধবীকে হারানোর খবরে মর্মাহত হন এবং ১৯৭৯ সালের ১১ই জানুয়ারি তিনি রচনা করেন সুন্দর একটি কবিতা—"দানুশকার আত্মার উদ্দেশে"।

আই ছিঙ সাহিত্যবিশেষজ্ঞ তথা আই ছিঙ জীবনীকার চউ হুঙ শিঙের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-সূত্রে জানতে পারলাম আই ছিঙের জীবনের আরো অনেক কিছু। কাও ঈঙ বললেন, 'চউ হুঙশিঙ আমার স্বামীকে আমার চাইতেও ভালো চেনেন, আমার তো ছাই কিছু মনেই থাকে না!'

আই ছিঙের সাথে সেই একবেলার সাক্ষাৎকার

একটি অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁর কবিতা-সমূহ আমি বাঙলায় অনুবাদ করছি জেনে আই ছিঙ খুবই খুশি হন এবং তাঁর সদ্য-প্রকাশিত একটি কবিতা সংগ্রহে কাঁপা-কাঁপা হাতে নাম লিখে তা আমায় উপহারও দেন। তাঁর স্ত্রী কাও ঈউ আমায় ঘুরিয়ে দেখান তাঁদের নিরিবিলি কয়েকটি ঘর। মাঝখানের ছোটো উঠানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় পেইচিঙের ফ্যাকাশে নীল আকাশটা। ছোটো-ছোটো সারিদেওয়া ফুলগাছের টবগুলো উঠানের শোভাবর্ধন করে।

আই ছিঙের সেই স্নেহভরা দৃষ্টি, সরল ভাবভঙ্গি আর সৌহার্দ্যময় কণ্ঠস্বরখানি আজও মনে জেগে ওঠে বার-বার।

আই ছিঙ-এর কবিতা

মূল চীনা রচনা থেকে অনুবাদ : প্রিয়দর্শী মুখোপাধ্যায়

আয়না

যদিও কেবল সমতল,
তবু মনে হয় সে যে অতল।
সে যে সত্যের অনুরাগী,
সে তো লুকায় না কভু ত্রুটি-বিচ্যুতি
—আছে সত্যের লাগি।

তাদের প্রতি সে অনুগত, যারা সন্ধান করে তারে,
যে কেহই হোক, তাহার মাঝারে খুঁজে পাবে
আপনারে,—
যদি মদিরায়—মুখ রাঙা হয়ে ওঠে,
কিংবা তুষার-সাদা কেশ ফুটে ওঠে।

তার তরে কভু লেগে যায় কারো মন,
কারণ—নিজেরা সুদর্শন।
আবার কেউ আছে—তারে পরিহার করে চলে,
কারণ—সে যে অকপট ; নির্ভয়ে সদা সত্য কথাই বলে।
আবার কেউ বা এমন আছে—
তারে ঘৃণায় চূর্ণ ক'রে দিতে চায়—মনটা তবেই বাঁচে!

কয়লার কথোপকথন

কোন্‌খানে থাক তুমি—আমি জানতে পারি নাকি ?
—আমি দশ সহস্র বছর পুরনো গিরির গর্ভে থাকি,
আমি অতি বন্ধুর প্রাচীন শিলার অভ্যন্তরে থাকি।

বয়স তোমার কত ?
—বয়স আমার হয়েছে অনেক পাহাড়েরও নয় তত,
পাষাণস্তূপেরও অল্প বয়স, নয় সে আমার মতো।

কত কাল হল নীরব রয়েছ তুমি ?
—যে-যুগে দানব-নাগিনী শাসন করেছিল বনভূমি
যখন প্রথম কম্পনে দুলে উঠেছিল ধরাভূমি।

তুমি কি চরম বিদ্বেষ ক্রোধে রয়েছ মৃত ?
—মৃত্যু ? না, না, আছে প্রাণ, আমি এখনও জীবিত,
দয়া ক'রে মোরে দাও হে আগুন, একটু আগুন ;
আছে প্রাণ, আমি এখনও জীবিত, এখনও জীবিত।

ভিখারি

উত্তরদেশে
ভিখারিরা করে আনাগোনা হোয়াঙ-হো নদীর দুপারে,
করে আনাগোনা রেলপথটির দুধারে।

উত্তরদেশে
ভিখারিরা অতি বিরক্তিকর স্বরে
গলা ছেড়ে বিলাপ করে,
বলে তারা এসেছে এক দুর্দশাক্লিষ্ট এলাকা থেকে,
এসেছে তারা যুদ্ধক্ষেত্র পিছে রেখে।

পেটের ক্ষুধা বড়ো ভয়ংকর,
তাতে বৃদ্ধ হারায় মায়া-মমতার লেশ,
সে যে শিশুকে শেখায় ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

উত্তরদেশে
ভিখারিরা নিষ্পলক চোখে
স্থির দৃষ্টি হানে তোমার মুখে।
যাই খাও-না, দেখবে তোমায় চেয়ে,
দেখবে তোমার নখের ডগায় দাঁত খোঁটার ওই রীতি।

উত্তরদেশে
ভিখারিরা বাড়ায় চিরপ্রসারিত হাত,
মিশমিশে কালো হাত,
চায় ভিক্ষা একটি তামার কড়ি,
হাত পেতে দেয়—সামনে যাকেই দেখে,
সৈনিকরাও পায় না রেহাই—একটি কড়িও নেইকো
যাদের ট্যাঁকে।

আশা

স্বপ্নের বন্ধু
অলীক কল্পনার ভগিনী

শুরুতে তোমার নিজের ছায়া
তবু সর্বদা চলে তোমার আগে

আলোর মতন নিরাকার
হাওয়ার মতন অবিরাম

তোমার ও তার মধ্যে
সর্বদা আছে ব্যবধান

জানালার বাইরে উড়ন্ত পাখির মতো
আকাশে ভাসমান মেঘের মতো

নদীতীরে প্রজাপতির মতো
সে যে কৌশলী অথচ সুন্দরী

তুমি ওঠ ওপরে, সে পালায় উড়ে
তুমি কর তাকে অগ্রাহ্য, সে নেয় তোমার পিছু

সে চিরকাল রইবে তোমার সহগামিনী
তোমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত অবধি।

জাপানি কবি দাইকাসু ইকেদা

সন্তোষকুমার দে

দাইকাসু ইকেদা সোকা গাক্কাই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি। বৌদ্ধধর্ম-অনুরাগী এবং বিশ্বশান্তির একজন প্রচারক হিসাবে ইউনাইটেড নেশনের শান্তিপদক এবং মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির সাম্মানিক ডকটরেট উপাধি পেয়েছেন। বহুগ্রন্থ-প্রণেতা ইকেদার কাব্য থেকে ইংরাজি অনুবাদগ্রন্থ "আশা ও স্বপ্ন" (*Hopes and Dream*) থেকে একটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া হল। অনুবাদ করে কবিতাটি নিউইয়র্ক থেকে পাঠিয়েছেন সন্তোষকুমার দে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. রবার্ট এপ এই ইংরাজি অনুবাদ করেছেন। জাপানি কবিতার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ কিছু করেছিলেন। আর করেছিলেন সেনট জেভিয়ার্স কলেজের বাঙলার অধ্যাপক প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বর্তমান অনুবাদক সন্তোষবাবু জানিয়েছেন মূল কবিতায় বা ইংরাজি অনুবাদে অন্ত্যমিল নেই। তাই বাঙলাতেও সে চেষ্টা করা হয় নি।

মাটি থেকে জাগা
দাইকাসু ইকেদা

পথিক
তুমি কোথা থেকে আসছ ?
কোথায় যাচ্ছ ?

আমি এগিয়ে চলি আলোর সন্ধানে
এই প্রদোষের কাছাকাছি অগোছালো সময়ে
যখন চাঁদ অস্ত গেছে
কিন্তু সূর্য ওঠে নি।

আমি মাটি থেকে জেগে উঠি
আমার মনের অন্ধকার দূর করতে
এমনি একটি উঁচু গাছ খুঁজি
যা কোনো ঝড়ে নোয়াতে পারে না।

মতামত

১

প্রসঙ্গ "উচ্চশিক্ষার গঙ্গাযাত্রা"

কিছুকাল আগে অধ্যাপক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য "উচ্চশিক্ষার গঙ্গাযাত্রা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন (চতুরঙ্গ, মার্চ ১৯৯০)। উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার উপর সেটি একটি বিরল আলোকপাত। উপাচার্যদের নির্বাচনপদ্ধতি ও ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ নির্দয় মন্তব্য করেছেন। তবে হয়তো অতখানি কঠোরতা উপাচার্যকুলের প্রাপ্য নয়। বলতে কী, ইদানীং কালে তাঁদের অবস্থা দেখে করুণাই হয় এবং অনেকেই বোধহয় আমার মতো ভাবেন যে নিতান্ত শহিদি মনোভাব ছাড়া কোনো সৎ, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কেন উপাচার্য হতে চান?

এককালে, সন্দেহ নেই, উপাচার্যপদের ক্ষমতা ছিল। আজকের পরিভাষায় সে ক্ষমতা 'স্বৈরাচারী' হলেও ক্ষমতার যাথার্থ্যে খাদ ছিল না। সম্মানও ছিল। সরকার এঁদের নিয়োগ করেন এক ধরনের 'স্টেবিলাইজার' যন্ত্ররূপে, যাঁদের মুখ্য কাজ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের নানাবিধ ন্যায়-অন্যায় চাপকে নিউট্রালাইজ করে স্ট্যাটাস ক্যো বজায় রাখা। কোনো উপাচার্যের পাঁচ বছরের কার্যকালে যদি বৃহৎ কোনো কেলেঙ্কারি, আন্দোলন ইত্যাদি না ঘটে, পরীক্ষা নিয়মিত গ্রহণ ও ফল প্রকাশিত হয়, তাহলে তাঁর কৃতিত্বে ধন্য-ধন্য পড়ে যায়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষা' ব্যাপারটির কী হল, এগোল না পিছোল, তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। ভালোই করেন, উপাচার্য মহাশয়ের সে বিষয়ে কিছু করারও ছিল না।

ম্যানেজমেনটের ছাত্ররা জানেন "পুরস্কার-তিরস্কার"-কাঠামো ছাড়া কোনো কর্মী-দলের কাছ থেকে সঠিক উৎপাদন আদায় করা দুরাশা। অর্থাৎ যে ফাঁকি না দিয়ে কাজ করবে, কাজের উৎকর্ষবিধানে হবে তৎপর, তার জন্য যেমন পুরস্কার, 'উন্নতি' ইত্যাদি, তেমনি যে কাজ করবে না বা ফাঁকি দেবে তার জন্য শাস্তি যথা, উন্নতি বন্ধ, বরখাস্ত ইত্যাদি। এই কাঠামো চালু করা তাঁদের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। প্রধান বাধা যথারীতি সরকার থেকে আসে, তবু সরকারি আর্থিক মুনাফার প্রশ্ন জড়িত বলে, যেনতেনপ্রকারেণ এ কাঠামো চালু রাখতে হয় এবং কিভাবে সে অসাধ্যসাধন, ম্যানেজমেনট শিক্ষার এক বড়ো অংশই তাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপাদন নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না, সরকার কোনোদিন খোঁজ নেন না যারা স্নাতক তাদের অক্ষরপরিচয়ের পর আর এগিয়েছে কি না, খোঁজ রাখেন শুধু ছাত্র আর অভিভাবকরা, তাঁদের নিজেদের স্বার্থে। জিজ্ঞাসাবাদ করলে দেখবেন—এঁরা ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় হায়ারার্কি-র মডেলটি জানেন, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম শ্রেণীর, কোন্‌গুলি দ্বিতীয় বা কোন্‌গুলি তৃতীয় শ্রেণীর।

এ প্রসঙ্গ থাক, এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কাজ চলে কী করে? যেখানে কাজ করলে পুরস্কার ত্বরান্বিত হওয়ার আশা নেই, কাজ না করলে শাস্তি নেই? পুরস্কার-তিরস্কার ছাড়া আর একটিমাত্র কারণে মানুষ কাজ করে থাকে—আদর্শবাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে। সে চেষ্টাও কতিপয় উপাচার্য মধ্যে-মধ্যে করেন, বক্তৃতা শুনে ঘুঘুরা মুখ লুকিয়ে হাসে, বোকারা হাঁ করে থাকে।

তাহলে আবার সেই প্রশ্ন: চলে কী করে? সোজা উত্তর, শিক্ষক-কর্মীদের সদিচ্ছার উপর ভিত্তি করে। এই আপাত নিরীহ উত্তরটি গোটা অবস্থার ভয়াবহতা ও উপাচার্যকুলের অসহায়ত্ব এক কথায় পরিষ্কার করে দেয়। আমাদের মতো দেশে, যেখানে সামাজিক

উন্নতির কোনো মোটিভেশন আজ পর্যন্ত কোনো দল বা সরকার তৈরি করতে পারে নি, সেখানে ব্যক্তি-বর্গের নিছক সদিচ্ছার উপর ভিত্তি করে একটা প্রতিষ্ঠান চালানো যায়? উপাচার্যরা নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ, নিতান্ত অপরাধীকেও তিনি শাস্তি দিতে পারেন না পদ্ধতির জটিলতার জন্য। যদিও বা পারেন, অমনি আন্দোলনের তুমুল তরঙ্গ। উপাচার্য তো পাঁচ বছরের অতিথি, যারা বিশ-পঁচিশ বছরের মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছেন, এবং প্রায়ই বংশ-পরম্পরায়, তাঁরা ছাড়বেন কেন? ওদিকে তাঁর পরামর্শদাতা বোর্ডের (যা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে উপাচার্যের কাজ অনুমোদনকারী বোর্ড) সদস্যরা প্রায়ই চোরকে চুরির ও গৃহস্থকে সজাগ থাকতে পরামর্শ দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী, অর্থাৎ উপাচার্যকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে গোপনে আন্দোলনকারীদের লেলিয়ে দিয়ে "রোমান" আনন্দ অনুভব করেন। সুতরাং অধিকাংশ উপাচার্য আপোসের পথে চলেন, চোখ বুজে থাকা ছাড়া তাঁর গতি নেই। এর ফলে, কর্মচক্রের কোথাও না কোথাও গতি ব্যাহত হয়, ক্ষুব্ধরা আরেক আন্দোলন শুরু করে, তারপর, তারপর চলতেই থাকে। বুদ্ধিমান ও কর্মকুশলী উপাচার্যরা যার জন্য চেষ্টা করেন সকল সমস্যা ঠেলে পিছোতে, যাতে তারা আরো জট-পাকানো অবস্থায় পরবর্তী উপাচার্যের ঘাড়ে পড়তে পারে। এর জন্য হাজার এক পদ্ধতি আছে। যথা, কমিটি নিয়োগ, তদন্ত, রিপোর্ট দানে বিলম্ব, অবশেষে রিপোর্ট দানে অপারগ হওয়ায় তাকে বাতিল করে পুনরায় কমিটি নিয়োগ, তাতে ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি। সময় কাটানো এ দেশে কী আর এমন শক্ত ব্যাপার। মুশকিল হয় এক ধরনের নিরীহ ব্যক্তিদের, যাঁরা তাঁদের ন্যায্য দাবি জানিয়ে এইরকম জটে পড়ে যান, তারপর ভোগান্তির একশেষ।

যে উপাচার্য ঘোরতর অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন না, অপেক্ষাকৃত কম-দোষীদের তিনি কী করবেন? তাই, যে অধ্যাপক অর্ধেক ক্লাস নেন না, বা যাঁর পড়াবার যোগ্যতাই নেই, তাঁদের বেলা শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। সত্য কথা বলতে কী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকের হাল দেখে আমার একটি গল্প মনে পড়ে। কোর্টে উকিল জোর সওয়াল করছেন দুই বিচাপতির সামনে। তাঁদের একজন বৃদ্ধ, কানে শোনেন না, অপরজনের সে দোষ না থাকলেও দ্বিপ্রাহরিক দিবানিদ্রায় ময়। শুনছেন না। হতাশায় বেপরোয়া উকিল বক্তৃতার মধ্যে একই সুরে বলে গেলেন, ওয়ান শ—ক্যান নট হিয়ার, থ্ব আদার শ—উইল নট হিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক আজ এই ক্যান-নট আর উইল-নট দলে বিভক্ত। যাঁরা একই সঙ্গে ক্যান আর উইল, দেখবেন প্রত্যেক ডিপার্টমেনটে তাঁরাই সংখ্যালঘু। ফল অতীব ভয়াবহ। তিরস্কৃত হওয়ার ভয় কোন্‌কালেই উবে গেছে, এক যা ছিল পুরস্কারের লোভ, তাকেও শুধুমাত্র কার্যকালের বিচারে অবধারিত করে দেওয়ায় বিদ্যাচর্চার উৎসাহ অন্তর্হিত। ভারতীয় উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেকটি হল এম. পি. এস., তাকে শক্ত করে ঠুকে দেওয়া হয়েছে।

জিজ্ঞাস্য হচ্ছে তাহলে চলে কী করে? উপাচার্য কি তাঁর অধস্তনদের কাছ থেকে কোনো আনুগত্যই পান না? অবশ্যই পান, যাঁরা তা দেখান বা উপাচার্যের আদেশ পালনে তৎপর হন, তাঁরা তা করেন নিয়মবিহিত প্রাপ্যের অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে। এই পুরস্কারের চরিত্র হরেক রকমের। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ মাতব্বরি পদলাভ থেকে শুরু করে, ডিপার্টমেনটে নিজের লোক ঢোকানো, অতিরিক্ত আর্থিক লাভ, বিদেশযাত্রা, মায় মেয়ের মার্কশিটে হেরফের, ছেলের চাকরি ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্তোষবাবু দেখিয়েছেন, আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি কী বিশাল আকার ধারণ করেছে। তার নানা

বিভাগ। সংবাদপত্রে প্রকাশ পাবে এমন কেলেঙ্কারি মুক্ত করে চালাতে গেলে উপাচার্যের সহকর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববন্টন ও সহযোগিতা প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই, এবং তা পেতে গেলে তাঁকে এই দান-খয়রাতগুলি করতে হয়। বুদ্ধিমান উপাচার্যরা এই গোষ্ঠীর (উপাচার্যরা আসেন যান, কিন্তু এই গোষ্ঠী অনড়) আকাঙ্ক্ষার আংশিক পূরণ করে ও বাকিটা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে কার্য উদ্ধার করেন। কারণ তাঁরা জানেন সর্ববিধ আশা পূরণ করলে সে ব্যক্তির যে আরো বায়না বাড়বে শুধু তাই নয়, প্রসাদ-বিতরণের প্রতিক্রিয়াও একটা আছে, তারো উগ্রতা বাড়তে থাকবে।

সে কথা থাক। তাহলে সকল উপাচার্যই কি দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছেন? তা বলা ভুল। কারণ, কেন্দ্র- আর রাজ্য-শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের অবস্থা সমান নয়। রাজ্যে অবস্থা আরো খারাপ, উপাচার্যকে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয় মন্ত্রণালয়ে। উপাচার্য হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে, শিক্ষামন্ত্রী হতে লাগে না, সুতরাং বালভাষিত অমৃত শুনতে হয়। তুলনায় কেন্দ্রীয়দের অবস্থা ভালো, 'দিল্লিতে আমাদের দল গদিনশীন' এই অজুহাতে রাজ্য-নেতারা একটু-আধটু বায়না করে থাকে, তা সে গ্রাহ্য না করলেও চলে।

অবস্থাটা কি এতটাই অন্ধকার? আর যদি তাই হয়, তবে শিক্ষকসমাজ মেনে নিচ্ছেন কেন? সন্তোষ-বাবু বলেছেন, তাঁরা সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। মার্জনা চেয়ে বলতে পারি, আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। কোনো রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম নিশ্চয় ঘটাতে পারে, কিন্তু সে বিশ্বাসই বা কোথায়? আমাদের দেশে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থনের মতো তাৎপর্যবিহীন। আসলে, অধ্যাপকসমাজের গরিষ্ঠাংশ কাজ-না-করে-অধিকতর-সুবিধা-আদায় করছেন ও করবেন বলে সমর্থন করছেন। স্বল্পাংশ ভুগছেন হতাশায়। তাঁরা জানেন যে-কোনো বিরোধিতা সংখ্যাগরিষ্ঠতার বুলডোজারের তলায় পিষে যেতে বাধ্য। সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দৈত্য সব জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডিপার্টমেনটাল মিটিং থেকে রাইটার্স, থেকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় পর্যন্ত। তাই সরকারি আইনে স্থির হয়েছে যে ব্যক্তি যথেষ্ট বিদ্যাগত যোগ্যতা অর্জন করে, মূল্যবান গবেষণাপত্র রচনা করে কঠিন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশের রাজধানীর সর্বোত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারের পদ পাবেন, তার সিকি যোগ্যতা নিয়ে বিহারের কোনো অখ্যাত ইউনিভার্সিটির লেকচারার একই পদমর্যাদা ও বেতনক্রম উপভোগ করবেন। পাঠকবর্গ জানেন, তবু আবার মনে করিয়ে দিই, দেশের যেসব অধ্যাপক তাঁদের যোগ্যতায় জন্য দেশেবিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন, গুণী ছাত্র তৈরি করেছেন, বিদ্যা-জগতে যাঁদের অবদানের জন্য তাঁদের নাম আপনারা জানেন, সেরকম একদল অধ্যাপক ও মাকালতলা কলেজের একজন জৈবিক অস্তিত্বসম্পন্ন অধ্যাপক একই বেতন পান। যোগ্য থেকে যোগ্যতর হওয়ার ইচ্ছে যে লোপ পাবে তাতে আশ্চর্য কী? ফলে ভালো ছাত্ররা দল বেঁধে হয় বিদেশে নইলে প্রাইভেট সেকটরে যোগ দিচ্ছে, সেখানে অন্তত যোগ্যতার সমাদর আছে।

অঙ্গাঙ্গী একটা প্রশ্ন থেকে যায়—তাহলে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির এহেন জীর্ণ কাঠামো টিকে আছে কী করে এবং কেন? অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় এপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, আমরা, ভারতীয়রা পুরাতনপ্রেমী, কোনো কিছু ভেঙে ফেলি না, ফেলে দিই না, যত্নে হোক অবহেলায় হোক রেখে দিই। অধিকাংশ বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে সেই কারণে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। আর্থিক মুনাফার প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে যোগ্যতায় ফাঁকি চলে না, তাই দেশে এত বিশ্ববিদ্যালয় থাকতেও স্বাধীন এলিট ইনস্টিটিউশনগুলি গড়ে উঠেছে আর উঠবে, যেমন, ইনস্টিটিউট অভ ম্যানেজমেনট বা টেকনোলজি। তাছাড়া মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়রূপ শ্বেতহস্তী পোষার পিছনে সামাজিক সমর্থনও একটা আছে। অতীতে এদেশে জমির মালিক আর প্রকৃত চাষির মাঝখানে এক বিরাট মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী ছিল, সময়বিশেষে যাদের সংখ্যা কুড়িরও অধিক হত। পরের-শ্রমে-দিন-গুজরান-করা এই শ্রেণী থেকে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের উৎপত্তি, কোনো যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, যাঁদের সযত্নে প্রতিপালন করা সমাজ তার কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে। হাজার হোক, ভদ্রলোকের সন্তান, অক্ষরপরিচয় আছে, গায়ে খেটে তো আর খেতে পারেন না। এঁরাই এখন চাকুরিজীবীদের গরিষ্ঠাংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অশিক্ষককুল এই দলেই পড়েন। একপাল অকর্মণ্য-সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার অন্তরালে এই ভদ্র-পোষণ মানসিকতাই কাজ করছে। উপাচার্যদের সাধ্য কি সেই স্থবির লেভিয়াথানে যৌবনের প্রাণ-সঞ্চার করেন। তাই তাঁদের রঙ্গমঞ্চে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটে। কালের পুতুলরা তাঁদের ভূমিকা পালন করে যান, ক্রমাগত, একই। তাই যাঁদের উচ্চ-শিক্ষার শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করার কথা ছিল, গঙ্গা-যাত্রার পুরোহিত হয়েই তাঁদের থাকতে হয়, বেচ্ছায়, এটুকুই যা খেদ।

অরুণ নাগ
কলকাতা

২

'আমি কিন্তু হিন্দু নই'

অগস্ট সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহাশয় 'ক্ষোভে-দুখে-হতাশায়' অনেক ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। প্রাজ্ঞ কথাসাহিত্যিক কী করে ভুলে গেলেন অন্যকে 'স্পর্ধিত অনৃতভাষী, অজ্ঞ, দেশের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাহীন, উদ্ভট মন্তব্যকারী, মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও মৌল-বাদীদের হাত শক্তকারী' বলে অভিহিত করলে তারও আবেগে আঘাত লাগতে পারে। এসব ব্যক্তিগত উনিশ শতকীয় উতোর-চাপানে আমার কোনো উৎসাহ নেই। মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে ভাবাবেগে পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি ভরানোর ক্ষেত্রেও আমার কোনো অভিরুচি নেই। শ্রীসিরাজ যদি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বিভ্রান্ত জনগণের সপক্ষে ও সংহতির স্বার্থে তত্ত্ব- ও তথ্য- নির্ভর মতামত প্রকাশ করেন, তবে হাজারবার সে সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য মানবিক আলোচনা করতে রাজি আছি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ভবিষ্যতে তাঁর কোনো মতামতের জবাব দিতে আমি অপারগ। ছয়-পৃষ্ঠা-ব্যাপী তিনি যে ব্যক্তিগত কথা-গুলি বলে অন্য একজন প্রবন্ধকারকে হেয় করার মানসিকতা প্রকাশ করেছেন তাতে আমি নিজে লজ্জাবোধ করছি। আমার একটি ভুলকে তিনি বিনয়প্রকাশের সদিচ্ছা হিসেবে না দেখে যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তাঁর মতো মানুষকে আর আমার বলার কিছু নেই। বাতাসের গলায় গামছা দিয়ে বচসা করার প্রবৃত্তি আর এ বয়সে নেই, আগেও ছিল না।

আপনাকে এসব কথা তো আমি কখনও বলি নি যে, আপনি 'গজদন্তমিনারে বাস করছেন, চায়ের দোকানে তথ্য শোনেন, তৃণমূল স্তরের মানুষজনের মধ্যে বড়ো হন নি, দেড়শতাধিক ছাইপাশ লিখেছেন, দেশ পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি লেখা দিতে পারেন নি, ছাব্বিশ বছরের মহানগর-বাস গ্রামের নাড়ির সঙ্গে যোগ ছিন্ন করতে পারে নি' প্রভৃতি অসংখ্য প্রগল্‌ভ বাক্য। এসব উক্তি আসছে কোথা থেকে? আপনি লিখেছেন, এঁদের কাছে যান সমীক্ষার জন্য, এই বই পড়ুন। কাদের সাহায্য নিয়ে সমীক্ষা করব সে তালিকা আপনি ঠিক করে দেবেন? এঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, এ ছাড়াও

অনেকে রয়েছেন যাঁদের তিনি জানেন না। তিনি অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝায়ের প্রচার-পুস্তিকাকে সোনার পাথরবাটি বলে গুরুত্ব দেন না। আমি দিয়ে থাকি। এটা হতেই পারে, আপনার মতের সঙ্গে না মিললে আপনি তাকে অস্বীকার করতেই পারেন। কিন্তু আপনার পাথুরে প্রমাণ আমার ওপরে চাপাবার কোনো এক্তিয়ারও আপনার নেই। মুর্শিদাবাদের 'মাটির প্রতি ইঞ্চি' আপনার নখদর্পণে,—আমার অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না, আমি কিছু লিখিও নি এ সম্পর্কে। আবার 'মুর্শিদাবাদের কোনো অধ্যাপক'-এর ছাপানো প্রচার-পুস্তিকার গুরুত্ব অস্বীকার করে অধ্যাপকটি মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে কিছু জানেন না—এমন উদ্ভট মন্তব্যে দম্ভ প্রকাশ পায়, সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় না।

এক, দো, সি, তবলা প্রভৃতি আরবি-ফারসি শব্দের কথা বলে শ্রীসিরাজ বলেছেন, 'দিব্যজ্যোতি-বাবু কি জানেন তবলা আরবি শব্দ?' আমি স্বল্প-শিক্ষিত, কিন্তু এই শব্দগুলো জানার জন্য খুব বেশি বিদ্যেবুদ্ধি লাগে না। নবম শ্রেণীর বাঙলা ব্যাকরণ বইতে বিদেশী শব্দভাণ্ডার পরিচ্ছেদটি খুললেই জানা যাবে। শ্রীসিরাজ পণ্ডিত মানুষ, কে অস্বীকার করেছে। কিন্তু 'পেডান্‌টিক' মানসিকতার শিকার হলে অন্যকে তাচ্ছিল্য করার মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি 'প্রকৃত ঐতিহাসিক বাস্তবতা' বোঝানোর জন্য আমার 'নিরেট অনৃতভাষণের' জবাবে যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন তাতে তিনি নিজে কোন্ সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন, তা একবার ভাববেন।

তিনি লিখেছেন, দিব্যজ্যোতিবাবু কি এঁর-এঁর প্রতিবেদন পড়েন নি? হ্যাঁ পড়েছি, এরকম বহু প্রতিবেদনই পড়েছি, কেননা সাম্প্রদায়িকতা ও আচারসর্বস্ব ধর্মকে ঘৃণা করি বলেই এগুলো খুঁজে পড়ি। বাউল-সুফি-পীর-ফকিরদের উদারতা সম্পর্কেও কিছু-কিছু জানি, এও জানি মৌলবাদের বীভৎস প্রভাবে আজ তাঁরা কোণঠাসা। কাটরা মসজিদ-শাহ বানো মামলা শ্রীসিরাজের চোখে তুচ্ছ মনে হতে পারে, আমি এইসব ঘটনায় অস্বাভাবিক বিচলিত বোধ করছি। কেননা, জানি শেষ বিচারে এরা পরাভূত হবেই কিন্তু মাঝে ঘটে যেতে পারে অনেক রক্তপাত। মানুষের জীবন আমার কাছে শত-সহস্র উপাসনাস্থানের চেয়েও মূল্যবান। এই মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত লড়াই করতে চাই। সেই মানসিকতা থেকে 'চতুরঙ্গে' প্রবন্ধ লিখেছিলাম, জানি না কেন সেই প্রবন্ধের বক্তব্য ছেড়ে শ্রীসিরাজ ব্যক্তিগত উতোর-চাপানে মেতে উঠলেন। আরও যেসব কথা তিনি লিখেছেন তার উত্তর দিতে আর ইচ্ছে করছে না। শ্রীসিরাজ নিজের চিঠিটি আর-একবার পড়বেন। অন্যে তাঁর মতো প্রাজ্ঞ পণ্ডিত না হতে পারেন, তবে অন্যেরও কিছু জানাশোনা থাকতে পারে।

শ্রীসিরাজ যদি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী তথ্য-তত্ত্ব সম্পর্কে মতামত দেন তবে অবশ্যই আলোচনা করব। ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসার কোনো জবাব দিতে রাজি নই। এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে পরাভব মেনে নিচ্ছি। রুচিতে বড়ো আঘাত লাগে। আসুন, কঠিন জেনে যখন সত্যকে ভালোবাসেন তখন সত্যকে যারা পরাভূত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। আর না জেনে কখনও অন্যকে সাম্প্রদায়িক-উশকানিদাতা বলে চিহ্নিত করবেন না (চতুরঙ্গ, অগস্ট ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩২৮, শেষ তিন লাইন)। আর-একটি ভুল ধারণা আপনার রয়েছে, আপনি আমাকে হিন্দু ভেবেছেন। আমি কিন্তু হিন্দু নই। ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পর্কিত কলম-কাজিয়া এখানেই শেষ হোক।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার
১১/২৮, কে. পি. রায় লেন
কলকাতা-৭০০ ০৩১

(এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত চাপান-উতোর পর্যায়ে আর কোনো চিঠিপত্র ছাপা হবে না—সম্পাদক)

THE JOY OF ENERGY

We try to give it to all those who labour with us to give the nation its most important and economical commercial energy resource COAL. More and more is being done to improve the living & environmental conditions of the miners who work day in and day out to keep wheels of the economy moving.

COAL INDIA LIMITED
10, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700 001